সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা

কৃষক নেতা হাতেম আলী খান

জুলফিকার হায়দার

সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা
কৃষক নেতা হাতেম আলী খান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা
কৃষক নেতা হাতেম আলী খান

জুলফিকার হায়দার

প্রাঙ্গণ প্রকাশন
কোরায়শী প্রাঙ্গণ, সি কে ঘোষ রোড
ময়মনসিংহ

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০০৩

প্রকাশনায়
প্রাঙ্গণ প্রকাশন
কোরায়শী প্রাঙ্গণ
ময়মনসিংহ

প্রচ্ছদ
মনোয়ারা খাতুন

স্বত্ব
আফরোজা আজিজ

মূল্য
পঞ্চাশ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
প্রাঙ্গণ প্রকাশন
কোরায়শী প্রাঙ্গণ
সি কে ঘোষ রোড
ময়মনসিংহ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার নানা
আরবী, ফারসী, উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত
ও একজন সফল শিক্ষক
ইসমাইল হোসেন তালুকদার
এবং
আমার মামা
ডাঃ হাতেম আলী তালুকদার
কে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

হাতেম আলী খান এ দেশের কৃষক আন্দোলন ও গণমুক্তি সংগ্রামের সামনের সারির একজন নেতা। দেশের নির্যাতিত-নিপীড়িত, শোষিত-বঞ্চিত ও সহায়-সম্বলহীন কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি জীবনভর রাজনীতি করেছেন। সমাজ থেকে অশিক্ষার অন্ধকার দূর করে আলোকিত মানুষ তৈরীর উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষা বিস্তারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছেন। প্রগতিশীল সাংবাদিকতার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এই ঘুণে ধরা সমাজটা বদলে দেয়ার মানসে জীবদ্দশায় তিনি নিরন্তর নিরবে কাজ করেছেন। অথচ সমাজ বদলের এই দক্ষ কারিগরকে আজ আমরা ভুলতে বসেছি।

কৃষক আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হাতেম আলী খান। বিশ শতকের প্রথমপাদে তার জন্ম। এ শতক বাঙালি জীবনে এসেছিল পারধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে, সাম্যবাদী চিন্তাধারায় নতুন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে। এই স্বপ্ন ও প্রত্যয় বাস্তবায়নে বাঙালি হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। হাতেম আলী খান এই অগ্নিগর্ভ সময়ের সন্তান। প্রথম জীবনে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদেন। পরবর্তীতে কমরেড মুজাফফর আহমদ ও শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গের মত নেতাদের সংস্পর্শে এসে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারী হয়ে পড়েন।

১৯১৯ সালে দেশে মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার চালু করা হলে এদেশের কৃষকরা ভোটাধিকার পায়। সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রজাআন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ছাত্রাবস্থায়ই হাতেম আলী খান প্রজাআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এর জন্য তিনি এলাকার জমিদারদের বিরাগভাজন হন, এমনকি তার প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়। কিন্তু এতে তিনি ভীত হননি বা আন্দোলন থেকে পিছুহটে যাননি। প্রজা আন্দোলনে তার বলিষ্ঠ ভুমিকার কারণে কৃষকদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। সর্বত্র তার নাম ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে বাঙলার কৃষকদের ওপর শোষণের অবসানকল্পে বামপন্থিরা ১৯৩৬ সালের ১১ এপ্রিল 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা' গঠন করেন। ১৯৩৭ সালে বাকুড়ার পাত্রসায়রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ই হাতেম আলী খান কৃষক সভার সদস্য হন এবং সংগঠনের শীর্ষ নেতা বংকিম মুখার্জি, আবদুল্লাহ রসুল, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, মনসুর হাবিবুল্লাহ প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ট হন। তিনি কৃষক সভার অনুকরণে নিজ এলাকায় সফল কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

www.pathagar.com

৪৭ -এ দেশ বিভাগের পর হাতেম আলী খান নানামুখী রাজনৈতিক স্রোতের সাথে সম্পৃক্ত হন। তারপরও ১৯৫১ সালে যখন কৃষকদের নতুন দাবী নিয়ে 'কৃষক সমিতি' পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয় তখন তাকেই সংগঠনের হাল ধরার জন্য এগিয়ে আসতে হয়। স্মরণযোগ্য, তিরিশের দশকে খাজনা, প্রজাস্বত্ব ও মহাজনী ঋণ; চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে ফসল ভাগের লড়াই এবং ষাটের দশকে জমি, কাজ, মজুরিবৃদ্ধি ও ঋণ ইত্যাদি নিয়ে যে কৃষক আন্দোলন হয়েছে হাতেম আলী খান সবগুলি আন্দোলনেই নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ত্যাগী নেতা হাতেম আলী খানের রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি রূপে তার জীবনভর সংগ্রামের বর্ণাঢ্য কাহিনী নিয়ে অনুজপ্রতীম লেখক ও সাংবাদিক জুলফিকার হায়দার 'সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা ঃ কৃষক নেতা হাতেম আলী খান' শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। হাতেম আলী খানের মত প্রচার বিমুখ একজন নেতার কর্মময় জীবন ও অমূল্য অবদানের কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। কাজটির শ্রমলব্ধ ও অনুসন্ধানমূলক, কাজেই খুব সহজসাধ্য নয়। তা সত্বেও এই ত্যাগী নেতার গৌরবোজ্জ্বল অবদান জাতির সামনে তুলে ধরার যে প্রয়াস জুলফিকার হায়দার চালিয়েছেন তার জন্য আমি তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

হাতেম আলী খানের ওপর ইতিপূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লেখা বের হয়েছে। কিন্তু তার ওপর এটিই প্রথম প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমবদ্ধতা রয়েছে। তার পরেও লেখকের এই প্রয়াস ও উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি মনে করি এ কাজের মধ্য দিয়ে তিনি একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন।

ভবিষ্যতের বিস্তৃত অঙ্গনে যারা নতুন পথের যাত্রী হাতেম আলী খানের সংগ্রামী জীবনালেখ্য আমাদের সেই নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা যোগাবে, সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেবে। হাতেম আলী খানের জীবন সংগ্রামের কাহিনী জাতীয় মানস গঠনের সহায়ক হবে। এ গ্রন্থ প্রণয়নের এটিই বড় সার্থকতা। তাই গ্রন্থপ্রণেতা স্নেহের জুলফিকার হায়দারকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাই। কামনা করি তার লেখনি সচল থাকুক, তিনি দীর্ঘজীবী হোন। আমার বিশ্বাস এ বই পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে।

জাকির হোসেন
নির্বাহী পরিচালক,
বুরো টাঙ্গাইল।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

বিশ শতকের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে হাতেম আলী খান এক অনন্য ও অবিস্মরণীয় নাম। তার জীবন সুদীর্ঘ সংগ্রামে স্পন্দিত। তার কর্মজীবন বিস্তৃত ও বিশাল। হাতেম আলী খানের রাজনৈতিক চেতনার উৎস ছিল ***বঞ্চিত জনগণ, খেটে খাওয়া কৃষককুল ও সর্বহারার দল***। সব সময় তিনি সহায়-সম্বলহীন কৃষককুলের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পুরোভাগে থেকেছেন।

একটি উন্নয়নশীল কৃষিপ্রধান দেশের একজন জাতীয় নেতার যেসব গুনাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, হাতেম আলী খানের মধ্যে তা ছিল। তার মৃত্যুর পর দুই যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই আমরা এই মহৎ মানুষ ও সত্যিকার জাতীয় নেতাকে ভুলতে বসেছি। তার সহকর্মী, সহযোদ্ধা ও আদর্শের অনুসারিরা তার সম্পর্কে যে নীরবতা পালন করছেন তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। প্রথমত ঃ এসব কারণেই হাতেম আলী খানের জীবনী রচনার কঠিন কাজে আমি হাত দিয়েছিলাম।

দ্বিতীয়ত ঃ আলবার্ট হুবার্ডের একটি বিখ্যাত উক্তি ইদানিং আমার মনকে নাড়া দেয়। তিনি বলেছিলেন, জীবনী দৃষ্টিভঙ্গিকে শানিত করে, এক জীবনে অনেক জীবন-যাপনের স্বাদ এনে দেয়। সংগ্রামী নেতা আলী হাতেম আলী খানের জীবনীর মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে। এটিই তার জীবনীগ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ সুকঠিন কাজে আমাকে সঠিক দিকনির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন হাতেম আলী খানের ঘনিষ্ঠ সহচর, প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা, কবি ও সুসাহিত্যিক অধ্যাপক নাজির হোসেন। তিনি পুরো পান্ডুলিপি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছেন। তার প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতি ছাত্রী আফরোজা আজিজ বইটির পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে আমাকে প্রভূত সহায়তা করেছে। আমি তার কল্যাণ কামনা করি।

এ বইটি লেখার জন্য যারা আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও নানা প্রকার তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তারা হচ্ছেন, দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী যতীন সরকার, সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, খগেশ কিরণ তালুতদার, কবি বুলবুল খান মাহবুব, অধ্যক্ষ গোলাম রব্বানী, সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া, কবি মাহমুদ কামাল, খন্দকার নাজিম উদ্দিন, অধ্যাপক বাদল মাহমুদ, অধ্যাপক শেখ জিনাত আলী, অধ্যাপক শফি উদ্দিন আহম্মেদ, অধ্যাপক মুসলিম উদ্দিন, শাজু

www.pathagar.com

রহমান, হুমায়ুন তালুকদার, হোসেন শহীদ, রফিকুল ইসলাম তালুকদার, হাসান কায়কোবাদ, রফিকুল ইসলাম খান জুয়েল, এস.এম আবদুল লতিফ, হাতেম আলী খানের পরিবারের সদস্য শামছুল ইসলাম খান (বাবলা) কবি জুলফিকার খান, তাহমিনা খান প্রমুখ।

শত ব্যস্ততা সত্তেও বইটির একটি সারগর্ভ, সমৃদ্ধ ও মূল্যবান 'মুখবন্ধ' লিখে দিয়েছেন বুরো টাঙ্গাইলের নির্বাহী পরিচালক অগ্রজপ্রতীম জাকির হোসেন। পাশাপাশি বইটি দ্রুত প্রকাশের স্বার্থে তিনি উদার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। শ্রদ্ধেয় জাকির হোসেন, সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) -এর নির্বাহী পরিচালক আবদুল হামিদ ভূঁইয়া, নাস-এর নির্বাহী পরিচালক রাহেলা জাকির, সেতু -এর নির্বাহী পরিচালক মির্জা সাহাদত হোসেন, যৌথ উদ্যোগ-এর নির্বাহী পরিচালক আবুল কালাম মোস্তফা এবং র‍্যাসডো -এর পরিচালক শহিদুল ইসলাম শাহিন এই বই প্রকাশে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। এ সহযোগিতা না পেলে বইটি এতদিন আতুঁর ঘরেই পড়ে থাকত, আলোর মুখ দেখতে পেত না। তাই এ সহযোগিতার জন্য আমি তাদের কাছে আকণ্ঠ ঋণী। এর জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির বর্ণবিন্যাসে সহায়তা করেছেন, খন্দকার মোস্তফা কামাল, শেখ আবদুল আলীম ও নূর মোহাম্মদ এবং কম্পিউটার ফরমেটিং-এর কাজ করেছেন আবদুল ওয়াদুদ রতন। স্বল্প সময়ে তারা এ কাজটি করেছেন এর জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। বইটি পাঠকদের উপকারে এলে আমার শ্রম স্বার্থক মনে করব।

জুলফিকার হায়দার
আচঁল
২/১০৯ শহীদ আবদুস সাত্তার সড়ক
কলেজ মোড়, ঘাটাই'ল
টাঙ্গাইল।

www.pathagar.com

সূচী

সূচনা	১৩
প্রথম জীবন	১৪
বাম রাজনীতি ও প্রজা আন্দোলন	২০
কৃষক সভার প্রতিষ্ঠা	২৭
কৃষক সমিতি গঠন	৪০
নানামুখী রাজনীতি	৪৩
ন্যাপ ও কৃষক সমিতির বিভক্তি	৫১
স্বাধীনতা সংগ্রামে হাতেম আলী খান	৫৯
স্বাধীনতা উত্তরকালে কৃষক সমিতি	৬১
উপসংহার	৬২
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	৬৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা
কৃষক নেতা হাতেম আলী খান

এদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক দূর্জয়, দৃঢ়সংকল্প, দৃপ্ত প্রত্যয়ী, আপোষহীন ও অবিসংবাদী নেতার নাম হাতেম আলী খান। বিশ শতকের **প্রথম এদেশে সংগঠিতধারায় কৃষক আন্দোলন হয়েছে। এ আন্দোলনে বাঙলার** মুষ্টিমেয় যে কয়জন নেতা নেতৃত্ব দিয়েছেন, হাতেম আলীখান তাদের অন্যতম। তিনি এদেশের গণমুক্তির সংগ্রামে সামনের সারির একজন নেতা।

আবহমানকাল ধরে যারা শোষণ ও নির্যাতনের শিকার, যারা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত, সেই দরিদ্র কৃষককূলের মধ্যে চেতনা সঞ্চার এবং তাদের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি আনায়নই ছিল হাতেম আলী খানের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ও সাধনা। তার বোধের বিপুল অংশ জুড়ে এই চেতনা ও আকাঙ্খা যে, মেহনতি কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তিনি রাজনীতি করবেন; নিজের সুখ-সুবিধা বা ক্যারিয়ার গড়বার জন্য নয়। এজন্য তিনি বছরের পর বছর কৃষকদের মধ্যে কাজ করেছেন, তাদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন মিশিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের সামগ্রিক চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনায়নের চেষ্টা করেছেন। তিনি শুধু কৃষকের মুক্তির লক্ষ্যেই কাজ করেননি, দেশের শিক্ষা বিস্তারেও অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। দেশের প্রগতিশীল সাংবাদিকতার তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক।

হাতেম আলী খান বিশ শতকের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য ও অবিস্মরণীয় নাম। বিশ শতক বাঙালি জীবনে এসেছিল বিদেশী অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে। এ শতকই বাঙালিকে সাম্যবাদী চিন্তাধারায় নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। বাঙালির চোখের সামনে সাম্রাজ্যবাদের বিভৎস চেহারা নগ্ন হয়ে ফুটে উঠেছিল। তাই শোষিত জনগণ আর মুখ বুজে সব অত্যাচার, অবিচার মেনে নিতে রাজী হয়নি। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তারা শামিল হয়, বাঙলার কৃষক শ্রমিক তাদের মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন দেয়। হাতেম আলী খান এই অগ্নিগর্ভ সময়ের সন্তান।

www.pathagar.com

এক ঃ প্রথম জীবন

১৯০৪ সালে ২৪ নভেম্বর তিনি টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার বেলুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম নায়েব আলী খান, মায়ের নাম সালমা খানম। নায়েব আলী খানের পিতার নাম ঝোমর আলী খান। তিনি তৎকালিন সিরাজগঞ্জ মহকুমার তেবাড়িয়া অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। ঝোমর আলী খান পূর্ব-পুরুষের ভিটামাটির মায়া ছেড়ে বাঙলা ১২৬০ সালে সস্ত্রীক বেলুয়া গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। বেলুয়াতে বসতি স্থাপনের ছয় বছর পর তিনি তালুক ক্রয় করেন। অল্প সময়ে তিনি এলাকার একজন বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাঙলা ১৩৬৮ সালের ২২ কার্তিক প্রথম পুত্র নায়েব আলী খানের জন্ম হয়। নায়েব আলী খানও পিতার মতই পরিশ্রমী, বৈষয়িক, বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিলেন। পৈত্রিক সম্পদ তিনি বহুগুণ বাড়িয়ে চারশ একর জমির মালিক হন। তার প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে হেমনগরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরীও তাকে সমীহ করে চলতেন। নায়েব আলী খানের আরও এক ভাই ছিলেন। তার নাম ছিল সাহেব আলী খান। সাহেব আলী খান কিশোর বয়সেই মারা যান।

নায়েব আলী খান দু'বিয়ে করেছিলেন। তার প্রথম স্ত্রীর গর্ভে চার ছেলে। এরা হচ্ছেন - নবাব আলী খান, হযরত আলী খান, আবদুল জব্বার খান ও আবদুর রশিদ খান। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে পাঁচ ছেলে। এরা হচ্ছেন - আহমদ আলী খান, আবদুল হামিদ খান, হাসমত আলী খান, হাতেম আলী খান ও আবদুল লতিফ খান। দ্বিতীয় পক্ষের চতুর্থ ছেলে হাতেম আলী খান ছিলেন একেবারে ব্যাতিক্রমী। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন জেদী, একরোখা এবং প্রতিবাদী।

হাতেম আলী খান ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান। প্রাচীর ঘেরা বাড়িতে সুন্দর সৃন্দর দালানকোঠা। পাইক-পেয়াদা, প্রজা-খাতকে বহির্বাটি সরগরম। বৌ-ঝি, চাকর-চাকরাণী এবং রাধুনি-বাবুর্চিদের কলকণ্ঠে অন্দরমহল মুখরিত। ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যের মধ্যে কেটেছে তার শৈশব কাল। এমন লক্ষীমন্ত পরিবারের ছেলে হয়ে তিনি যে একদিন লক্ষীছাড়াদের দলে ভিড়বেন, অভিজাত সমাজের সংস্পর্শ ছেড়ে দিয়ে দেশের দূর্ভাগা চাষীদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন মিলিয়ে দিবেন, মহত্তর আদর্শের জন্য এমন উন্মুখ হয়ে উঠবেন তা ছিল অকল্পনীয়।

নিজ গ্রামের মক্তবে হাতেম আলী খানের শিক্ষায় হাতেখড়ি। এরপর তিনি হেমনগর হাই স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল বেজে ওঠে। ১৯১৬ সালে হাতেম আলী খান যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তখন তিনি সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্য আবেদন করলেন। এ আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষকের প্রযত্নে

www.pathagar.com

তার নামে একটি ফরম এসে পৌছুল। ফরম দেখে প্রধান শিক্ষকের চক্ষুস্থির। তিনি ফরমটি সহকারি প্রধান শিক্ষক জ্যোতিষ চক্রবর্তীর হাতে দিলেন। জ্যোতিষ বাবু প্রিয় ছাত্র হাতেম আলী খানকে ডেকে প্রথমে বকাঝকা করলেন। শেষে অনেক বুঝিয়ে তাকে সৈন্যদলে যোগদান করানো থেকে নিবৃত্ত করলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে টাঙ্গাইল অঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী একটা আবহাওয়া ছিল। সে সময়ে এ অঞ্চলে অনুশীলন সমিতির বেশ কিছু সদস্য ছিলেন। হাতেম আলী খান যে ব্রিটিশ আর্মি স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগদানের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন এ বিষয়টি তার বড় ভাইয়ের এক বন্ধু মাখন চন্দ্র দেবের কানে পৌছুল। মাখন চন্দ্র ছিলেন পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি হাতেম আলী খানের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠলেন এবং তাকে দলভূক্ত করার জন্য তৎপরতা শুরু করলেন। তার চেষ্টায় হাতেম আলী খান বিপ্লবী দলের কর্মী হয়ে ওঠেন এবং নিজেকে একজন প্রকৃত বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করেন। এ বিষয়ে তিনি পড়াশোনা শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি ব্যায়াম, কুস্তি, লাঠি খেলা, তলোয়ার চালনা ইত্যাদি অনুশীলন শুরু করেন। শরীর সক্ষম ও সক্রিয় রাখার জন্য তিনি বিভিন্ন সময় সাঁতার কাটতেন এবং দারুণ শীতে খালি গায়ে থাকতেন। এভাবে নিজেকে তিনি বিপ্লবী আদর্শের একজন সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলেন।

অনুশীলন সমিতির সংগঠনগুলি ছিল খুব মজবুত। সমিতির সদস্যরা দেশের জন্য প্রাণদানে সর্বদাই প্রস্তুত থাকত। বিশ শতকের শুরু থেকেই অনুশীলন সমিতি বাঙলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। ১৯০৭ সালের মধ্যে শুধুমাত্র ঢাকা কেন্দ্রের অধীনে সমিতির পাঁচশ'টি শাখা খোলা হয়। 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকা বের করা হয়। সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন আখড়ায় নিয়মিত শরীর চর্চা করতেন। আখড়ায় শুধু শরীর চর্চাই হত না - এখানে ছাত্র-যুবকদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করা হত। উচ্চ রাজকর্মচারীদের খুন আর স্বদেশী ডাকাতি করার জন্য এই সমিতি ব্যাপক আয়োজন করে। বাঙলায় প্রথম স্বদেশী খুন আরম্ভ হয় ১৯০৬-৭ সালে। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী এই পথের প্রথম পথিক। তাদের লক্ষ্য ছিল কিংসফোর্ড। বাঙলায় জজ থাকাকালে কিংসফোর্ড বহু স্বদেশীকে বেত্রদণ্ডের আদেশ দেন। পরে তিনি বদলি হয়ে মজফরপুরে যান। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী তাকে হত্যা করার জন্য মজফরপুরে যান। তারা কিংসফোর্ডের গাড়ী লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। কিন্তু গাড়িতে তখন কিংসফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন কেনেডি নামে একজন ইংরেজ আইনজীবী ও তার স্ত্রী। গুলিবিদ্ধ হয়ে তারা দু'জন মারা যান। কেনেডি হত্যাই বাঙলায় প্রথম স্বদেশীদের হাতে ব্রিটিশ নাগরিক খুন। এরপর একটানা চলে রাজনৈতিক খুন ও

www.pathagar.com

ডাকাতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অধিকতর বৃদ্ধি পায়। হাতেম আলী খান বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী দলের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন।

কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হাতেম আলী খানকে অন্য একটি নেশা পেয়ে বসে। আর তা হচ্ছে দেশ ভ্রমণের নেশা। ১৯১৮ সালে তিনি সবার অগোচরে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। সঙ্গে সম্বল মাত্র ১৯ টাকা। এই অল্প টাকা সঙ্গে করে একদিন কলকাতায় এসে তিনি হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষমান একটি ট্রেনে চেপে বসলেন। তারপর যাযাবরের মত তিনি ঘুরে বেড়ালেন দিল্লী, আগ্রা, বিন্ধ্যপর্বত, নর্মদা, পুনা, আরাবল্লী প্রভৃতি স্থান। কিন্তু অচেনাকে চেনা, অদেখাকে দেখার আকাঙ্খা অপূর্ণ রেখেই একদিন বাড়ি চলে আসতে হয়, কারণ তার পাথেয় শেষ। বাড়ি ফিরে আসার পর সবাই দু'দিন খুব বকাঝকা করলেন। কিন্তু হাতেম আলী খান বাধ্য ছেলের মত নীরবে সব শুনলেন। অল্প বয়সে একাকী ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণে তিনি এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। সমস্ত ব্যাপারে তার মধ্যে এক ধরণের সচেতনতা সৃষ্টি হল।

১৯২০ সালে তিনি হেমনগর হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি লেখাপড়ার জন্য কলকাতায় চলে যান। রিপন কলেজে তিনি আইএ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯১৯ সালের ৩ মার্চ 'রাওলাট আইন' পাশ হয়। এর প্রতিবাদে ৬ এপ্রিল সারা ভারতে হরতাল পালিত হয়। হিন্দু মুসলমান একযোগে এর প্রতিবাদ জানায়। ভারত জুড়ে আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায়। ১৩ এপ্রিল জালিওয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার ওপর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। সরকারি হিসাব মতে এই হত্যাকান্ডের ফলে চারশ লোক নিহত ও এক হাজার লোক আহত হয়। অন্য দিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ যে ভূমিকা নেয় তাতে এ দেশের মুসলমানরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলনের অপূর্ব ক্ষেত্র তৈরি হয়। ১৯২০ সালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এই দু'টি ধারা এক সংগ্রামের মঞ্চে মিলিত হয়। দু'ধারার মিলনে এক অপূর্ব শক্তি সঞ্চারিত হয়।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণপরিণতি লাভ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা বাঙলায় এক বিরাট গণজাগরণের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস খিলাফত মৈত্রির ফলে সারা দেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের বান ডেকে যায়। একই কণ্ঠ থেকে 'বন্দে মাতরম' ও 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সে আন্দোলনের ওপর হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। কলকাতার কোর্ট-কাচারি থেকে উকিল-মোক্তার এবং স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-শিক্ষকরা রাস্তায় নেমে আসে। অসহযোগ আন্দোলনের সে ঢেউয়ে হাতেম আলী

www.pathagar.com

খানও কলেজ ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন। সক্রিয় ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। রিপন কলেজের প্রায় চার হাজার ছাত্র একডাকে বের হয়ে এসে মিছিলে শামিল হয়। মিছিল বঙ্গবাসী কলেজ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়ে শেষ হয়। আন্দোলন দিন দিন তুঙ্গে ওঠে। প্রত্যেক দিন কলেজ স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ার, হারিশ পার্ক, ওয়েলিংটন স্কোয়ারসহ যেখানে খোলা জায়গা সেখানেই সভা হত। হাজার হাজার জনতা বক্তৃতা শুনে চঞ্চল হয়ে ওঠত।

হাতেম আলী খান এ আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় তিনি কবি নজরুল ইসলাম, আবদুল হালিম, আবদুল্লাহ রসুল, সূর্য সেন, সত্যেন সেন, জিতনে ঘোষ প্রমুখ দেশবরেণ্য সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে তিনি নিজ এলাকায় চলে আসেন। নিজ এলাকায় অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসাবে বিলাতি পণ্য বর্জন, জমিদারদের খাজনা ও মহাজনদের দাদনের টাকা বন্ধ করে দেয়ার জন্য তিনি এলাকাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। এ জন্য টাঙ্গাইল অঞ্চলের সকল জমিদার এমনকি তিনি নিজ পিতারও বিরাগভাজন হন।

আন্দোলন জোরদার করার জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে জনসভা করে বেড়ান। এ কারণে তিনি পিতৃ সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন। ফলে অর্থ কষ্টে পড়ে তাকে সে সময় ঘোড়ার পিঠে কাপড় বোঝাই করে হাটে হাটে বিক্রি করে জীবননির্বাহ করতে হয়। এভাবে বছর খানেক কাটানোর পর তিনি পুনরায় কলকাতা ফিরে যান। আবার লেখাপড়ায় মন দেন। ১৯২৪ সালে তিনি রিপন কলেজ থেকে আই এ পাশ করেন এবং বি এ ক্লাসে ভর্তি হন।

বিএ ক্লাসে ভর্তির কিছুদিন পর পূনরায় তিনি গ্রামে ফিরে যান এবং জমিদার জোতদার বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। এলাকায় জনসভা করে তিনি অত্যাচারী জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। এ ধরণের প্রচারণার ফলে উত্তর টাঙ্গাইলের সব জমিদার তো বটেই - তার পিতা নায়েব আলী খানও ক্ষতিগ্রস্ত হন। নিজ গ্রামে নায়েব আলী খানের ৯০ হাজার টাকার দাদন ছিল। হাতেম আলী খানের উস্কানির ফলে ওই দাদনের সুদ আসল কোনটাই পরিশোধ করেনি। শুধু তাই নয়, বিপুল সংখ্যক বর্গাদার বর্গা ফসল দেয়া বন্ধ করে দেয়। এ সময় নায়েব আলী খানের বহু জমি বেহাত হয়ে যায়। এতে তার বাবা এবং উত্তর টাঙ্গাইলের জমিদাররা তার ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি আবার কলকাতা ফিরে যান।

www.pathagar.com

কলকাতায় ফিরে তিনি কলেজ হোস্টেলে আশ্রয় নেন। এখানে তার তিনজন বন্ধু জুটে যায়। এরা হচ্ছেন শান্তিপুরের নূরমোহাম্মদ, দিল্লীর অতুল চন্দ্র এবং মধ্য প্রদেশের এ,কে, মাহমুদ। নূরমোহাম্মদ এবং অতুল চন্দ্র ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র এবং মাহমুদ ছিলেন রিপন কলেজের ছাত্র। এরা সবাই ছিলেন হাতেম আলী খানের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ সময় তার আরো দু'জন অসমবয়সী বন্ধু জুটে যায়। এদের একজনের নাম গোবর্ধন দাস, অপর জনের নাম শ্রীশচন্দ্র শীল। এই ক'জন মিলে ন্যাশনাল লীগ নামে একটি গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলেন। পরে আরো অনেকে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে তারা কলেজ স্কোয়ারে থিওসফিস্ট হলে এক সভা আহবান করেন। চীনের কনসাল তাতে বক্তৃতা করেন। কিছু কিছু সামাজিক কর্মসূচী থাকলেও বিপ্লবী রাজনীতির দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করাই ছিল এ সংগঠনেরমূল উদ্দেশ্য।

ন্যাশনাল লীগের কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি পাঠাগার ও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করে। লীগ কর্মীরা ওই এলাকার যুবকদের সমবেত করে তাদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করত। তাদেরকে বিপ্লবী বইপত্র পাঠ করতে দিত। এসব কাজের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন দেশপ্রেমিক যুবক গোপন বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেয়। সংগঠনের প্রসার ঘটে। বিজ্ঞানের কিছু ছাত্রও এ সংগঠনের সদস্য হন। তারা বোমা তৈরির ফর্মূলা সংগ্রহ করেন এবং বোমা তৈরি করা শুরু করেন। তাছাড়া, নানা ধরণের অস্ত্রশস্ত্র তৈরিরও চেষ্টা করেন। এই গোপন সংগঠনের কাজে হাতেম আলী খান বিহার, গয়া, কাশী, চন্দন নগর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। ওই সব স্থানে তিনি সংগঠনের সদস্যদের নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ দেন।

এক বছর অবাধে ন্যাশনাল লীগের কাজ চালানোর পর, পুত্রের বিপ্লবী তৎপরতার খবর পৌছে গেল পিতা নায়েব আলী খানের কানে। তিনি হাতেম আলী খানকে হুশিয়ার করে দিলেন যে, বিপ্লবী কর্মকান্ড থেকে সরে না এলে মাসোহারা বন্ধ হয়ে যাবে। এ সময় তাকে ১৭০ টাকা মাসোহারা পাঠানো হত। মাসোহারা যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তার জন্য তিনি সংগঠনের কাজে ঢিলা দিয়ে পড়াশোনায় মন দিলেন। লেখাপড়ায় তাকে মনোযোগী হতে দেখে নায়েব আলী খান সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ব্যারিষ্টারি পড়ানোর জন্য পুত্রকে তিনি বিলেতে পাঠাবেন। কিন্তু জমিদার পিতা যাকে ব্যারিস্টার বানানোর স্বপ্ন দেখতেন, পরবর্তীতে তিনি হলেন কৃষকের সত্যিকারের একজন দরিদ্র বন্ধু। তার জীবনের এই মোড় পরিবর্তনের মূলে ছিলেন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজাফফর আহমেদ।

স্মরণযোগ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঙলার মানুষের জীবন প্রবাহ শুধু বদেল দেয়নি, বদলে দেয় মানুষের ইতিহাস চেতনার আবেগ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের

www.pathagar.com

অভিঘাতে এদেশের অনেক কিছু বদলে যায়। মহাযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের ভিতকে দারুণভাবে আঘাত করে। ১৯০৪ সালে রুশ জাপান যুদ্ধে জারশাসিত রাশিয়ার পরাজয়ে এশিয়ার মানুষের কাছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যে অপরাজেয় মুর্তি গড়ে ওঠেছিল ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সে মহিমায় ক্ষুন্ন হল। তাদের নিজেদের মধ্যকার আত্মঘাতি সংঘর্ষ দেখে পরাধীন দেশগুলির লাখ লাখ মানুষের মনে আশার সঞ্চার হল। তারা ভাবতে শিখল সাম্রাজ্যবাদকেও পরাস্ত করা যেতে পারে। তারপর ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের বিস্ময়কর ঘটনায় সচকিত হয়ে ওঠে এদেশের মানুষ। গভীর অনুসন্ধিৎসায় প্রত্যক্ষ করে রুশ বিপ্লবের সমস্ত ঘটনাবলী।

তারা দেখল অক্টোবর বিপ্লবের বেলাভূমিতে রাশিয়া সমাজতন্ত্রের বীজ বুনে চলেছে। লেনিন নামের একজন মানুষ খোদাই করে চলেছেন সমাজতন্ত্রের শরীর। এ দেশের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব যখন মন্টেগু চেমর্সফোর্ডের শাসন সংস্কারের টোপ গেলার প্রতিযোগিতায় মগ্ন, তখন ভোলগার তীর ঘেষে পৃথিবীর মানচিত্র বদল শুরু হয়ে গেছে। মেহনতি মানুষের দল কমিউনিস্ট পার্টি সর্বহারা শ্রেণীর সরকার তৈরি করে ফেলেছেন। গরীব মানুষেরা সে দেশের যাবতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক হয়ে গেছে, ব্রিটিশ সরকার না চাইলেও রুশ বিপ্লবের খবর নানা রকমের অলিগলি ধরে এদেশে আসতে শুরু করে। মানুষকে আলোড়িত করে তোলে।

www.pathagar.com

দুই ঃ বাম রাজনীতি ও প্রজা আন্দোলন

১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে বাঙলার বিভিন্ন পেশায় প্রগতিশীল ব্যক্তিদের একত্রিত করে কৃষক শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত করা হয়। কমরেড মুজাফফর আহমেদ, ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত, অতুল গুপ্ত, আবদুল হালিম, হেমন্ত সরকার প্রমুখ শ্রমিক কৃষক পার্টি গঠন করেন। অনুশীলন পার্টির বহু বিপ্লবী তখন মার্কসবাদের দিকে ঝুকে পড়েন এবং শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ঠিক এই সময়ে ১৯২৬ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতার হ্যারিসন রোডের একটি বাসায় কমরেড মুজাফফর আহমেদ ও শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গের সঙ্গে হাতেম আলী খানের পরিচয় ঘটে। পরিচয় ক্রমশঃ নিবিড় হয়। মুজাফফর আহমেদ ও ডাঙ্গের সঙ্গে পরিচয়ে হাতেম আলী খানের চিন্তার জগতে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ধীরে ধীরে কমিউনিজমের দিকে ঝুকে পড়েন।

এ সময় সাপুরজি সাকলাতওয়ালা এদেশ আসেন। সাপুরজি হলেন শিল্পপতি রতন টাটা পরিবারের লোক। তিনি গ্রেট বৃটেনে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার কারণে টাটা কোম্পানির লন্ডনস্থ অফিস থেকে তাকে ছাটাই করা হয়। পরে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সদস্য নির্বাচিত হন। কলকাতায় এসে সাপুরজি বউবাজারে বেঙ্গল কর্মাশিয়াল চেম্বার হলে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার তার চিন্তার স্বচ্ছতা, দেশপ্রেম, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা দেখে হাতেম আলী খান চমৎকৃত হন। তিনি মার্কবাদ প্রচারে মনস্থির করেন।

১৯২৬ সালের ১২আগস্ট কমরেড মুজাফফর আহমদ 'গণবাণী' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোড থেকে এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। গণবাণী অফিস তখন কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে। গণবাণীকে কেন্দ্র করে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, এদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা চলত। মার্কসীয় দর্শন, রুশ বিপ্লব, কমিউনিস্ট আন্দোলন, ১৯২৬ সালে ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘট ইত্যাদি বিষয় গণবাণীতে প্রাধান্য পেত। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গণবাণী তখন বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। হাতেম আলী খান এ সময় প্রতিদিন গণবাণী অফিসে আসতেন। নগদ পয়সায় ২০/২৫ টি গণবাণী কিনে গোপনে কলেজ হোস্টেলের বিভিন্ন কক্ষে ওই সব পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। এসব কাজ-কর্মের পরও তিনি পড়াশোনা অব্যাহত রাখেন এবং বি,এ. পাশ করেন। এর অল্প কিছুদিন পর হাতেম আলী

www.pathagar.com

খানের পিতা নায়েব আলী খান মারা যান। পিতার মৃত্যুতে তিনি দারুণ শোকাহত হন।

১৯২৭ সালে সারা দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। দেশ জুড়ে শ্রমিক আন্দোলন দূর্বার হয়ে ওঠে। ট্রেড ইউনিয়নে বামপন্থি শ্রমিক নেতৃত্ব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শ্রমিকরা বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করে। এদিকে ১৯২৮ সালে 'বেঙ্গল ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্টস পার্টির' প্রথম সম্মেলন কলকাতার আলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, কৃষকদের জন্য ব্যাপকভাবে কৃষক সমিতি গড়ে তুলতে হবে। তারপরই বিভিন্ন জেলায় কৃষক সমিতির গড়ার কাজ শুরু হয়ে যায়। ধীরে ধীরে কৃষক সমিতির সাংগঠনিক শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এ সময় হাতেম আলী খান নিজ গ্রাম বেলুয়ায় ফিরে আসেন এবং কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

উল্লেখ্য, বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলাদেশে প্রজা আন্দোলন দানা বাধতে থাকে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রজা আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ১৯১৪ সালে জামালপুর মহকুমার কুমারচরে এক বিশাল প্রজা সম্মেলন হয়। ওই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শেরে বাঙলা এ,কে ফজলুল হক। বক্তৃতা করেন রাজিব উদ্দিন তরফদার, খোন্দকার আহমেদ আকালুবি, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ কৃষক নেতারা। তবে ১৯১৯ সালের আগে প্রজা আন্দোলন তেমন জোরালো হয়ে ওঠেনি। ১৯১৯ সালে মন্টেগু চের্মসফোর্ড সংস্কার চালু করা হলে কৃষকরা ভোটাধিকার পায়। সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু হয়ে যায়। ১৯২০ সালে জে,এন রায় নামে একজন ব্যারিষ্টার প্রজাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন।

১৯২১ সালে একজন ইতালীয় মিশনারী নদীয়া জেলার এক গ্রামে একটি কৃষক সমিতি স্থাপন করেন। ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৯২১ সালে বরিশাল ও ১৯২৬ সালে ঢাকায় দু'টি বড় প্রজা সম্মেলন হয়। ১৯২৫ সালে কাওড়া এবং ১৯২৬ সালে বীরভূমে রায়তসভা স্থাপিত হয়। ১৯২৪ সালে উদারাপন্থি নেতা মৌলবী নওশের আলী এবং ওয়ালিউর রহমানের নেতৃত্বে যশোরের নড়াইল এলাকায় প্রজা আন্দোলন শুরু হয়। তাছাড়া, কুমিল্লায় কৃষ্ণ সুন্দর ভৌমিক, মোখলেছুর রহমান, আবদুল লতিফ রায়ত সমিতি গঠন করে জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২৫ সালে বগুড়াতে এক বিশাল প্রজা সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হয়। সমাজবাদী চিন্তা ভাবনায় প্রভাবিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে শ্রমিক কৃষক দল গঠন করেন। ১৯৩৪ সালে নিখিল প্রজা সমিতির নাম পরিবর্তন করে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি বা কৃষক

www.pathagar.com

প্রজা পার্টি রাখা হয়। প্রজাপার্টি বিনা খেসারতে জমিদার প্রথা উচ্ছেদ- 'লাঙ্গল যার জমি তার' ইত্যাদি ধ্বনি তোলে। আর কৃষক চেতনায় তা বিপুল সাড়া জাগায়।

১৯১৪ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রজা আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯২১ সালে বাঙলার সম্পন্ন কৃষকরা সার্ভে ও সেটেলমেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। সেটেলমেন্ট কর্মচারীদের অবৈধ কার্য-কলাপে কৃষকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে পাবনা ও বগুড়াতে কয়েকজন অফিসার প্রহৃত হন। এ সময়ে কৃষক প্রজাস্বত্ব ইউনিয়ন বোর্ড ও চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠায় ট্যাক্স আদায় করা দুরুহ হয়ে পড়ে। ফলে সরকার ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। সরকারি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন কৃষকদের খাজনা বন্ধ আন্দোলন করতে উৎসাহী করে তোলে। ময়মনসিংহের কৃষকরা খিলাফত নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খাজনা দিতে অস্বীকার করে। রাজশাহীতে ওয়াহাবি নেতা আবদুল্লাহ্ বাকী কৃষকদের জমিদারদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করেন। এ অঞ্চলে সরকার ট্যাক্স ও খাজনা আদায় করতে ব্যর্থ হয়। তমলুক কাঁথিতে সরকারি খাস মহলে এবং মেদেনীপুর জমিদারিতে খাজনা আদায় করা সম্ভব হয়নি।

প্রজা আন্দোলন প্রসার ঘটার প্রেক্ষিতে হাতেম আলী খান নিজ এলাকার কৃষকদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। তার সাংগঠনিক দক্ষতার গুণে উত্তর টাঙ্গাইলের কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা জমিদারের খাজনা; মহাজনের দাদন এবং বর্গা জমির ফসল প্রদান বন্ধ করে দেয়। এতে জমিদার-জোতদাররা ক্ষিপ্ত হয় এবং তারা একজোট হয়ে কৃষকদের ওপর নির্যাতন শুরু করে। এ আন্দোলনে কৃষকরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হাতেম আলী খানের প্রাণ নাশের চেষ্টাকরা হয়। তিনি এলাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে গেলেও এ অঞ্চলের কৃষকদের চেতনা শাণিত হয়ে ওঠে।

এ সময় হাতেম আলী খানকে একজন বিষয়ী মানুষ হিসাবে গড়ে তোলবার জন্য অভিভাবকরা তাকে বিয়ে করানোর জন্য তোড়জোর শুরু করেন। ১৯২৭ সালে হাতেম আলী খান কালিহাতি উপজেলার চিনামুড়া গ্রামে বিয়ে করেন। তার স্ত্রীর নাম কসিমুন্নেসা খানম। তার শ্বশুরের নাম আবদুল করিম খান। কিন্তু সংসার তাকে কখনোই তেমনভাবে ধরে রাখতে পারেনি। স্ত্রীর সঙ্গে তার কখনোই তেমন যোগাযোগ ছিল না। কারণ তার তের বছর কেটেছে জেলে, দশ বছর কেটেছে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতায়, বাকী সময় কেটেছে রাজনীতি ও কৃষক সংগঠন গড়ার কাজে। এরপর যে সামান্য সময় তিনি পেয়েছেন তা সংসারের কাজে ব্যয় করেছেন। তিনি ছয় সন্তানের জনক ছিলেন। এরা হচ্ছেন - শরিফা খানম (বাসন্তি), কামরুজ্জামান

www.pathagar.com

খান (খসরু), শামসুজ্জামান খান (মাখন), সেতারুজ্জমান (বাদল), রওশনআরা (মালতি) খানম ও ফিরোজা খানম (আরতি)। মেয়েদের ডাকনামে হিন্দুয়ানা গন্ধ থাকায় গোড়া মুসলিম সমাজ তাকে নানাভাবে সমালোচনা করে। কিন্তু হাতেম আলী খান এসব সমালোচনা মোটেই গ্রাহ্য করেননি।

বিয়ের এক বছর পর ১৯২৮ তিনি কলকাতায় চলে যান। এ বছর তিনি এম,এ পাশ করেন এবং তার পড়াশোনার পাঠ চুকে যায়। এ বছর তিনি কলকাতা থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করবে পরিকল্পনা করেন। যার মাধ্যমে মেহনতি মানুষের সুখ-দুঃখের কথা জনগণের সামনে তুলে ধরা যায়। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। টাকার কোন ব্যবস্থা না করতে পেরে হাতেম আলী খান বাড়ি চলে গেলেন। তারপার স্ত্রীর অজান্তে সত্তর ভরি স্বর্ণের গহনা নিয়ে একদিন কলকাতায় চলে এলেন। গহনা বিক্রির টাকা দিয়ে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। কবি নজরুল ইসলাম ও কমরেড মুজাফফর আহমেদের ইচ্ছানুযায়ী পত্রিকার নামকরণ করা হল 'সর্বহারা'। প্রায় ছয় মাস পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহতভাবে চলে। এরপর বন্ধ হয়ে যায়। সর্বহারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার উদ্যোগে প্রথমে 'চাষী-মজুর' ও পরে 'দিনমজুর' নামে আরো দু'টি পত্রিকা বের হয়। কিন্তু অর্থের অভাবে এ পত্রিকা দুটোও বন্ধ হয়ে যায়। এসব পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রাখার জন্য হাতেম আলী খান অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন। পত্রিকার অর্থের যোগান দেয়ার জন্য তিনি সকাল-সন্ধ্যা কুলিগিরি করেছেন এবং বহুদিন খিদিরপুর ডকে কুলির কাজ করেছেন।

পত্রিকা প্রকাশনায় সুবিধা করতে না পেরে হাতেম আলী খান কিছুদিন সাংগঠনিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। ১৯৩২ সালে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সিরাজগঞ্জে এক প্রজা সম্মেলনের আহবান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সভাপতিত্ব করেন খান বাহাদুর আবদুল মমিন। এ বিশাল কৃষক সভায় বক্তৃতা করেন সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, বিপিন পাল, দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মহাত্মা গান্ধী, অধ্যাপক জে, এল ব্যানার্জী, শেরে বাঙলা একে ফজলুল হক, মাওলানা আজাদ, মাওলানা আকরাম খা, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আবদুল্লাহিল বাকী প্রমুখ। সম্মেলনে গৃহিত প্রস্তাবে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, খাজনা হ্রাস, নজর সেলামী বাতিল এবং চক্রবৃদ্ধি হারে মহজানের সুদ বাতিল করার দাবী জানানো হয়। হাতেম আলী খান কলকাতায় বসে সম্মেলনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি নিজ এলাকায় ফিরে এসে কৃষক প্রজাদের মধ্যে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

www.pathagar.com

১৯৩৩ সালে তিনি কলকাতা থেকে নিজ গ্রামে বেলুয়াতে চলে আসেন। এ সময় তার পারিবারিক জীবনে চরম দূর্ভোগ নেমে আসে। স্ত্রী কসিমুন্নেসা খানম দ্বিতীয় সন্তান জন্মদানের পর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এরপর সারা জীবন তিনি এই মানসিক ভারসাম্যহীন স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করেছেন। এর জন্য তাকে দারুণ দূর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। কিন্তু সাংগঠনিক কাজের মধ্যে ডুবে থেকে তিনি সংসারের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনা ভুলে থেকেছেন। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বহুবার তাকে ঢাকা ও কলকাতায় নিয়ে গেছেন। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর সামান্য সুস্থতার লক্ষণ দেখা গেলেও পূনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। স্ত্রীর অসুস্থ হওয়ার পর বেশ কিছু দিন তিনি তার পাশেই থেকেছেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সভা ও বৈঠক করতেন। এসব বৈঠকে তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কথা-বার্তা বলতেন। সবাই মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনতেন।

হাতেম আলী খানের পরিবার ছাড়াও বেলুয়ার কাছাকাছি আরো দু'জন প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। একজন হচ্ছে হেমনগরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী। তার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল চার লাখ টাকা। অন্য জন ছিলেন ধনবাড়ির নওয়াব আলী চৌধুরী। তিনি ছিলেন আরো বড় জমিদার এবং বঙ্গীয় সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রি। এ অঞ্চলে জমির পরিমাণ ছিল ত্রিশ শতাংশে এক বিঘা। খাজনার পরিমাণ ছিল প্রতি বিঘায় এক টাকা। হেমনগর ও ধনবাড়ির জমিদার মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে, তারা ত্রিশ শতাংশের পরিবর্তে সাতাশ শতাংশে বিঘার মাপ চালু করবেন। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য উভয় জমিদারের আওতাভূক্ত এলাকায় নায়েব, গোমস্তা, আমিনরা নতুন করে জমি জরিপ করা শুরু করে। অন্যদিকে পাইক-পেয়াদা, বরকন্দাজরা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পায়তারা চালায়, বর্ধিতহারে খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের তাগিদ দেয়া শুরু করে। প্রজারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। জমিদারের ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত। খাজনা বকেয়া থাকলে ধনবাড়ির জমিদার পেয়াদা পাঠিয়ে কাচারিতে বেধে নিয়ে আসার হুকুম দিতেন। তারপর কাচারির সামনে একটা বিশাল শিমুল গাছে তাকে ঝুলিয়ে বেদম প্রহার করা হত। নির্মম প্রহারে সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে যেত। তারপর অজ্ঞান অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেয়া হত।

অন্যদিকে হেমনগরের জমিদারও বকেয়া খাজনার জন্য প্রজাদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালাতেন। আগুন লাগিয়ে প্রজাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হত অথবা হাতি দিয়ে বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে চুরে দেয়া হত। এসব জমিদারদের অন্যায়-অত্যাচার বন্ধের জন্য হাতেম আলী খান দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি রায়তদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বাইশটি গ্রামের কৃষক প্রজাদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তাদের পরামর্শ দেন। তার দক্ষ নেতৃত্বের

www.pathagar.com

কারণে ছাতারকান্দি, হাদিরা, খরিষা, খামার পাড়া, ভোলার পাড়া বনমালিসহ বাইশটি গ্রামরে কৃষকরা জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। সবাই মিলে জমিদারের খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়। জমিদারের সহায়তায় পুলিশ এগিয়ে আসে। শুরু হয় অন্যায়-অত্যাচার উৎপীড়ণ, ফলে ধীরে ধীরে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

এলাকার কৃষকদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য হাতেম আলী খান গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। পরিচিত সবার খোঁজখবর নিতেন। কৃষকদের নানা সমস্যার কথা শুনতেন। কোন জমির ফসল কেমন হল সরেজমিনে গিয়ে তা দেখতেন এবং চাষাবাদ সম্পর্কে কৃষকদের নানা পরামর্শ দিতেন। এ সময় তার সঙ্গে একটি সাইকেল থাকত, কিন্তু কখনও তিনি সাইকেল আরোহণের সুযোগ পেতেন না। কারণ রাস্তায় বের হলে সব সময় দু'একজন লোক থাকতেন - তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি গ্রামের আল-পথ দিয়ে হাটতেন। তাই সাইকেলে ওঠার সুযোগ তার কখনো হত না। ১৯৩৫ সালে এলাকাবাসী তাকে ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি নির্বাচনে সদস্য প্রার্থী হন এবং নির্বাচনে বিজয়ী হন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আন্তরিকতা নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৩৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি গোপালপুর থানার বেঙ্গুলাতে এক বিশাল প্রজা সম্মেলনের আয়োজন করে। হাতেম আলী খান এ সম্মেলনে যোগদান করেন। এতে সারা দেশে প্রায় এক লাখ কৃষক যোগদান করেন। সাবেক মন্ত্রি সৈয়দ নওশের আলী, মাওলানা শামসুদ্দিন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী। করটিয়ার জমিদার মসউদ আলী খানপন্নী এ সম্মেলনে বাধাদানের চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃষকদের স্বতস্ফুর্ত প্রতিরোধের মুখে জমিদারের লোকেরা পালিয়ে যায়। এ সম্মেলনের অভিজ্ঞতা কৃষক সম্মেলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে হাতেম আলী খানকে অনুপ্রাণিত করে। বেলুয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে এ সম্মেলনের প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারি। এ সময় হাতেম আলী খান অনুধাবন করেন যে, কৃষকের পশ্চাদপদতার মূল কারণ হচ্ছে অশিক্ষা। সুতরাং এ সময় থেকে তিনি শিক্ষার প্রসারে মনোযোগী হন এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে সচেষ্ট হন।

১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি সময়ের তিনি ভালুকা থানার বাটাজোড় গ্রামে চলে আসেন। কয়েক বছর অক্লান্ত চেষ্টায় সেখানে তিনি একটি জুনিয়র মাদ্রাসাকে হাই স্কুলে পরিণত করেন। ১৯৪২ সালের বাটাজোড় স্কুল বোর্ডের মঞ্জুরি পায়। এরপর তিনি নিজ এলাকায় চলে আসেন। বেলুয়া এসে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ভূয়াপুর হাই স্কুলে সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজ

www.pathagar.com

গ্রাম বেলুয়াতে জনতা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। স্কুলটি এখনও রয়েছে। তার পরিবারের লোকেরাই এখন পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বে রয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হাতেম আলীখানের নাম মুছে ফেলে তার পরিবারের একজন সাবেক চেয়ারম্যানের নাম প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। এ লজ্জা শুধু তার পরিবারের নয়, সমস্ত জাতির। হাতেম আলী খানের মত একজন শিক্ষানুরাগী, নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মী ও ত্যাগী রাজনৈতিক নেতার নাম মুছে ফেলে তার অবর্তমানে তারই প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যখন সামান্য একজন গ্রাম্য টাউটের নাম খোদিত হয় - তার চাইতে লজ্জার আর কি থাকতে পারে। ওই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হাতেম আলী খানের নাম যাতে প্রতিস্থাপিত হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

শুধু বেলুয়াতেই নয় বাঙলার কৃষকের ঘুমন্ত চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলা এবং শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য হাতেম আলী খান বলরামপুর, নলিন ও ধূবলিয়াতে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের জন্য তিনি একাই একসাথে তিনটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। শুধু নিজ এলাকায় নয়, শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলেও শিক্ষকতা করেছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি স্কুলের জন্য ছাত্র সংগ্রহ করেছেন। দরিদ্র ছাত্রদের নিজ খরচে বই-পুস্তক কিনে দিয়েছেন। দেশে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া এবং আলোকিত মানুষ তৈরির জন্য হাতেম আলী খান অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

১৯৪৩ সালে হেমনগরের প্রতাপশালী জমিদারর পরিবারে সদস্য সূর্যকান্ত চৌধুরীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে হাতেম আলী খান হেমনগর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সাল তিনি পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালনে তিনি তার যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। চার বছর প্রেসিডেন্ট থাকার সময় তিনি এলাকায় অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে ময়মনসিংহে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি গঠিত হয়। সুধীন রায় ওই কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। এর কিছুদিন পর টাঙ্গাইলে কমিউনিস্ট পার্টির মহকুমা কমিটি গঠিত হয়। হাতেম আলী খান, খোন্দকার আবদুল বাকী, নারায়ন বিশ্বাস, আবদুর রহমান প্রমুখের নেতৃত্বে মহকুমা কমিটি গঠিত হয়। এ সময়ে নারায়ন বিশ্বাস, খন্দকার আবদুল বাকীসহ অন্যান্যরা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সরাসরি জড়িত থেকে কাজ করা শুরু করেন। অন্যদিকে হাতেম আলী খান কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক ফ্রন্টে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

তিন ঃ কৃষক সভার প্রতিষ্ঠা

বাঙলার কৃষক যুগ যুগ ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগী সামন্ত বাদী জমিদার-জোতদার, তালুকদার এবং মহাজনের নির্মম শোষণ ও জুলুমে নিপীড়িত ছিল। এই শোষণ ও নিপীড়ণের অবসানকল্পে বামপন্থিরা নতুনভাবে কৃষক সংগঠন গড়ার দিকে দৃষ্টি দেন। এরই পরিণতিতে ১৯৩৩ সালের মার্চে মেদেনীপুরের ঘাটাল শহরে এক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বংকিম মুখার্জী এতে সভাপতিত্ব করেন। পরে কলকাতার আলবার্ট হলে বংকিম মুখার্জীকে সভাপতি ও হেমন্ত সরকার, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, মোখলেসুর রহমান, অতুল গুপ্ত, আবদুল হালিম, সরোজ মুখার্জি, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখকে নিয়ে গঠিত হয় 'কৃষক সংগঠনী' কমিটি। ১৯৩৬ সালের ১১ এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা গঠিত হয়।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত হয়। এ উপলক্ষে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে কৃষক সভা, কৃষক প্রজা সমিতির প্রার্থীদের সমর্থন করে। ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় কৃষক সমিতির নিজস্ব প্রার্থী দাড় করানো হয়। ত্রিপুরা জেলায় দশটি আসনের সবগুলিতেই কৃষক সমিতির প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। এর মধ্যে কৃষক সমিতির সভাপতি অসিমুদ্দিন আহমদসহ পাঁচজন প্রার্থী জয়লাভ করেন। নোয়াখালি জেলায় কৃষক নেতা সৈয়দ আহমদ খা কৃষক সমিতির প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেন।

১৯৩৭ সালে বাকুডার পাত্রসায়রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১১,০৮০ জন। সম্মেলনের সভাপতি মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন কমরেড মুজাফফর আহমেদ, সৈয়দ আহমেদ খান. ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত (আনন্দ বাজার পত্রিকার সম্পাদক), অসিমুদ্দিন আহমদ, সতেন্দ্র নাথ মুজমদার। সম্মেলনে বিশটি জেলা থেকে আশি জন প্রতিনিধি যোগ দেন। বঙ্কিম মুখার্জী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন রমেন্দ্র দত্ত, অনন্ত মুখার্জী, তারাপদ গুপ্ত, নিহারেন্দু মজুমদার, সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর, সুধীর দাস গুপ্ত, মনসুর হাবিবুল্লাহ ও পশুপতি ব্যানার্জী।

কৃষক সভার লক্ষ্য ছিল বিনা খেসারত জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, ক্ষেত মজুরদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বিতরণ, বিদেশী পূজির শোষণের অবসান, মহাজনী ঋণ মওকুফ, প্রকৃত ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যাস্ত করা, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির স্বপক্ষে সংগ্রাম। পাত্রসায়রে পর বর্ধমান জেলার কুড়মন গ্রামে (ডিসেম্বর ১৯৩৭) কৃষক সভার এক বৈঠক হয়। এ সময় কৃষক সভার সদস্য সংখ্যা দাড়ায় ৩৫,৭৭৫ জন।

www.pathagar.com

কৃষক সভার সদস্য হওয়া সম্পর্কে গঠনতন্ত্রে বলা হয় যে, ক. কৃষক সভার উদ্দেশ্য মেনে নিলে এবং এর নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে প্রস্তুত থাকলে - এক বছরের চাঁদা দিয়ে যে কোন কৃষক সভ্যশ্রেণীভূক্ত হতে পারবেন। খ. কৃষি-মজুর ও দরিদ্র গ্রাম্যশিল্পীজীবীগণও কৃষক সভার উদ্দেশ্য মেনে নিলে এবং এর নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে প্রস্তুত থাকলে বার্ষিক এক আনা চাঁদা দিয়ে এর সভ্য হতে পারবেন। গ. যারা চাষ করে জীবন ধারণ করেন না, অথচ কৃষকের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলে মনে করেন এবং কৃষকের অধিকার লাভের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছেন - তারা বার্ষিক এক টাকা চাঁদা দিয়ে কৃষক সভার সদস্য হতে পারবেন। হাতেম আলী খান ১৯৩৭ সালের দিকে কৃষক সভার প্রাথমিক সদস্যপদ লাভ করেন।

কৃষক সভা বাঙলাদেশের কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে. কৃষকরা জমিদারি প্রথার উচ্চেদ ও মহাজনের ঋণ মওকুফের দাবীতে সর্বত্র আন্দোলন শুরু করে। জেলায় জেলায় বড় বড় কৃষক জমায়েত হয়। দেশে কৃষক আন্দোলনের এক জোয়ার সৃষ্টি হয়। কৃষক সভার কাস্তে, হাতুড়ি চিহ্নিত লাল পতাকার তলে সেদিন নানা দাবী নিয়ে কৃষকরা সমবেত হতে শুরু করে। এ সময় বাঙলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টি ক্ষমতাসীন ছিল। তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর হামলা চালায় এবং তার শিকার হয় কৃষক সভার কর্মীরা। নানা স্থানে তাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। চব্বিশ পরগনার হাড়োয়া থানায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়, ১০৭ ও ১৫৩ ধারায় সাধারণ কৃষকদের গ্রেফতার করা হয় এবং কিছু কর্মীকে জেলেও পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন পাশ হয়, তাতে সরকার মনোনীত স্থানীয় মাতব্বরদের ওপর ঋণ সম্পর্কে সালিশী করার দায়িত্ব দেয়া হয় এবং আদালতের মামলার ডিক্রি জারি মূলতবি রাখার ক্ষমতা দেয়া হয় ঋণ সালিশী বোর্ডকে। তার ফলে দেনাদার কৃষকদের সুবিধা হয় এই যে, ঋণ আদায় স্থগিত রাখা হয় এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা দীর্ঘ মেয়াদে কিস্তিবন্দি করে দেয়া হয়। কৃষকদের এই অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কৃষক সভার কর্মীরা বহু খাতককে সাহায্য করেন। তার ফলে কৃষক সভার সংগঠন ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

১৯৩৮ সালের ২-৩ ডিসেম্বর হুগলি জেলায় বড়ায় কৃষক-সভার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পঁচিশ হাজার কৃষক যোগদান করে। দ্বিতীয় সম্মেলনে গঠনতন্ত্রের কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়। এতে প্রাথমিক কৃষক সমিতি গঠন ও কাজকর্মের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। সম্মেলনে মুজাফফর আহমেদ, আবু হোসেন সরকার, বঙ্কিম মুখার্জি, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত এবং নিহারেন্দু দত্তকে নিয়ে সভাপতি মন্ডলী গঠন করা হয়। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ রসুল। সম্পাদক-মণ্ডলীর সদস্যরা ছিলেন - অনন্ত মুখার্জি, বিমল প্রতিভা দেবী, রেবতি বর্মন, মানিক ব্যানার্জি, নিরাপদ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ ব্যানার্জি, চারু ব্যানার্জি, রবি মজুমদার, মনসুর হবিবুল্লাহ, সত্য চ্যাটার্জি, রবি মজুমদার, মনসুর হাবিবুল্ল, সত্য চ্যাটার্জি, সুধীর ঘোষ, সুশীল দাস গুপ্ত, শ্যামা প্রসন্ন ভট্টাচার্য ও সুব্রত নাগ। বড়া সম্মেলনের কয়েক মাস পর ১৯৩৯ সালের এপ্রিলে গয়াতে এক কৃষক সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনের আহবান বাঙলার কৃষক আন্দোলনের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে।

কৃষক সভার তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৯ সালের ৪-৫ মে, মালদহ জেলার নঘরিয়ায়। এ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সময় কৃষক সভার সদস্য সংখ্যা ৫০ হাজারে উন্নীত হয়। সমাবেশে প্রায় ৭৫ হাজার কৃষক উপস্থিত হয়। এ সম্মেলনে নেতৃত্বের কোন পরিবর্তন হয়নি। এ সম্মেলনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে আন্দোলনে আরো বেশী সংখ্যক চাষী ও ক্ষেতমজুরদের টেনে আনা, সংগঠনের কাজের জন্য সর্বত্র কৃষক ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা, কৃষক মজুরদের রাজনীতি শিক্ষা দিয়ে শ্রেণী চেতন করে তোলা এবং কৃষক ভলান্টিয়ারদের আন্দোলনের কর্মীতে পরিণত করা। সর্বোপরি প্রাথমিক সমিতিগুলি সক্রিয় ও শক্তিশালী করে তোলা।

নঘরিয়ার সম্মেলনের অব্যবহিত পরে কৃষক সভার নেতৃবৃন্দ কৃষক-প্রজা সমিতির সঙ্গে একটা নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি দেন। কারণ কৃষক-প্রজা পার্টির ঘোষিত নীতি ছিল কৃষক প্রজাদের স্বার্থের দিকে নজর রাখা। কাজেই কৃষক সভা তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করা তাগিদ অনুভব করে। কৃষক-প্রজা পার্টির মন্ত্রিসভায় ফজলুল হক, ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ ও চকিদিঘীর জমিদার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়কে স্থান দেয়। ফলে কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে দু'টি উপদলের সৃষ্টি হয়। একদল ছিল সরকার ঘেষা, অন্যদল 'বামপন্থি' হয়ে পড়ে। বামপন্থি অংশের সঙ্গে কৃষক সভা আন্দোলনে ঐক্য গড়ার ব্যাপারে আলোচনায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। কৃষক সভার নেতারা তখন কৃষক-প্রজা সমিতিকে কৃষক সভার সাথে মিলিয়ে দেবার কথাও চিন্তা-ভাবনা করেন। সেই উদ্দেশ্যে উভয় সংগঠনের পাঁচজন প্রতিনিধি নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। তাতে কৃষক সভার প্রতিনিধি ছিলেন কমরেড মুজাফফর আহমেদ, বঙ্কিম মুখার্জি ও আবদুল্লাহ রসুল এবং কৃষক-প্রজা পার্টির প্রতিনিধি ছিলেন - আবুল মনসুর আহমেদ ও নবাবজাদা হাসান আলী চৌধুরী। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্বেও সমন্বয় কমিটি দু'সংগঠন ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারেনি।

www.pathagar.com

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসাবে এদেশও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে কৃষক সভার সাংগঠনিক কাজকর্ম চালানোর জন্য সম্পাদকমণ্ডলী সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি ইশতিহার বের করে। ইশতিহারে খাজনার হার অর্ধেক করা, নদী-নালা সংস্কার, পাট ও ধানের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ, ক্ষেতমজুরদের নিম্নতম মজুরি ধার্য, ভাগচাষীদের দখলিস্বত্ব দেয়া ও জমিদারের আবওয়াব আদায় বেআইনী ঘোষণা করা এবং বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করা হয়। ইশতেহারে আরো বলা হয় যে, কৃষক নেতাদের শুধু অর্থনৈতিক দাবি দাওরা কথা বুঝলেই চলবে না; তাদের রাজনীতি বুঝতে হবে। কলকারখানার মজুরদের সাথে কৃষকদের নিবিড় সম্পর্ক রাখতে হবে। কৃষকদের মধ্য থেকেই কৃষকদের নেতা তৈরি করতে হবে। এ বছর (১৯৩৯) দু'একজন নেতা একটি পাল্টা কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয়নি।

১৯৪০ সালের ৮-৯ জুন যশোর জেলার পাজিয়াতে কৃষক সভার চতুর্থ সম্মেলন অনষ্ঠিত হয়। ওই বছরের প্রথম দিকেই কৃষক সভার বহু কর্মী ও নেতার ওপর সরকারি দমন পীড়ণ শুরু হয়। সবকিছু উপেক্ষা করে সম্মেলনে প্রায় এক'শ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে যারা সভাপতিমন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন তারা হচ্ছেন - কমরেড মুজাফফর আহমেদ, বঙ্কিম মুখার্জি, সৈয়দ নওসের আলী, আবু হোসেন সরকার, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন আবদুল্লাহ রসুল। যারা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন তারা হচ্ছেন - আবদুল মোমিন, নলিনী প্রভা ঘোষ, গোপাল হালদার, শ্যামা প্রসন্ন ভট্টাচার্য, চারু ব্যানার্জি ও শিবুনাথ ব্যানার্জি। ১৯৪১ সালে কৃষক সভার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ ১৯৪০-৪১ সালে কৃষক সবার প্রায় দু'হাজার কর্মী ও সদস্য মামলায় জড়িত হয়ে পড়ে।

১৯৪২ সালে জুন মাসে রংপুর জেলার ডোমারে কৃষক সভার পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় কৃষক সভার অনেক নেতা জেলে বা আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন বলে তারা সম্মেলনে যোগ দিতে পারেননি। কোন রকমে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। তাই সংগঠনের নেতৃত্ব কোথাও কোন পরিবর্তন করা হয়নি। এ সময় কৃষক সভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার। উল্লেখ্য কৃষক সভা বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে প্রচার করে। এ কারণে তদের ওপর সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর আক্রোশ তীব্র হয়ে ওঠে। কিন্তু উপনিবেশিক শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কৃষক সভা সারা বাঙলায় ৩০০ জনরক্ষা কমিটি গঠন করে এবং ৫০,০০০ হাজার ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করে। এ সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে বহু কৃষককে ঘর-বাড়ি, জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু তাদের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয় না। কৃষক সভা এসব ভাগ্যবিড়ম্বিত কৃষকদের সংগঠিত করতে শুরু

www.pathagar.com

করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে কৃষকরা যখন বিপদের মুখোমুখি হয় কৃষক সভা তখন তাদের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে।

১৯৪৩ সালের ১০-১২ মে ময়মনসিংহ জেলার নালিতাবাড়ীতে কৃষক সভার ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষক সভার পূর্ববর্তী সম্মেলনগুলির তুলনায় নালিতাবাড়ী সম্মেলন ছিল সবচেয়ে সংগঠিত এবং কর্মীদের জন্য অত্যন্ত উৎসাহবাজক। সম্মেলন স্থানের নাম হয় কাইয়ুর নগর। দু'টি সুদৃশ্য তোরণ তৈরী করা হয়। প্রয়াত কমরেড ত্রিলোচন সরকারের নামে ত্রিলোচন তোরণ এবং কমরেড নীলমনি বকসীর নামে নীলমনি তোরণ। একটি পোষ্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা এর নাম কমরেড সোমেন চন্দ প্রদর্শনী। পোষ্টার একেছিলেন মনি রায়। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন গোপাল হাওলাদার, সম্মেলনে রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন বঙ্কিম মুখার্জি।

কাইয়ুর শহীদদের স্মরণে সম্মেলন স্থানের নাম রাখা হয়েছিল কাইয়ুর নগর। মালাবারের কাইয়ুরের গ্রাম অঞ্চলে পুলিশ কৃষকদের ওপর অত্যাচার করে ও তাদের সম্পত্তি লুট করে। প্রতিবাদে কৃষকরা মিছিল বের করে। একজন পুলিশ গ্রামের একজন মহিলাকে অসম্মান করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রামবাসীরা পাথর ছুড়ে ওই পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করে। হত্যার অভিযোগে পুলিশ চারজন কৃষককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। অভিযুক্ত চারজনকে ফাঁসি দেয়া হয়। ১৯৪৩ সালের ২৯ মার্চ কানানুর জেলে মাতাদিল আপপু, কুনজামবু নায়ার, আবু বকর ও চিরুকুন্দন নামের চারজন কৃষককে ফাঁসি দেয়া হয়। পুলিশ তাদের লাশও ফেরত দেয়নি। এই শহীদদের নিয়ে বিনয় বায় গান রচনা করেন এবং সম্মেলনে তা গাওয়া হয়।

সম্মেলনে কমরেড মুজাফফর আহমদ, বঙ্কিম মুখার্জি, হাজি মুহম্মদ দানেশ, প্রমথ ভৌমিক ও সৈয়দ নওশের আলী প্রমুখ সভাপতি মন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। আবদুল্লাহ রসুল সাধারণ সম্পাদক এবং গোপাল হালদার ও মনসুর হাবিবুল্লাহ যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। সম্পাদকমন্ডলীতে ছিলেন ভবানী সেন, মনিসিং, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, দিনেশ লাহিড়ী, সত্যনারায়ন চ্যাটার্জি, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ রনধীরদাসগুপ্ত প্রমুখ। বাঙলার পঁচিশটি জেলার মধ্যে তেইশটি জেলা থেকে ১৬৯ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। নদীয়া ও বাকুড়া থেকে কেউ আসেনি। এরপূর্বে কোন সম্মেলনে এত বেশি প্রতিনিধি হাজির হয়নি। এ সময় কৃষক সভার সদস্য সংখ্যা ছিল ১,২৪,৮৭২ জন।

সম্মেলনে প্রধান বিষয় ছিল খাদ্য সমস্যা। এ বছর বাঙলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইতিহাসের এই বেদনাদায়ক ও মর্মন্তুক অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। বাঙলার কৃষকের জন্য এটি ছিল এক ভয়ঙ্কর দুঃসময়। উপনিবেশিক সরকারের অমানবিক শোষণ, নিপীড়ন-নির্যাতন ও বর্ব্বর উদাসীনতার

www.pathagar.com

কারণেই এ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে মাঝামাঝি সময় থেকে এ দুর্ভিক্ষ শুরু হয় ; ১৯৪৪ সালে মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ স্থায়ী হয়েছিল। মন্বন্তরের দুর্বিপাকে শত শত মানুষ গৃহহীন হয়, স্বজন হারায়, হারিয়ে ফেলে নীতিবোধ ও মান-মর্যাদা। মন্বন্তরে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। মৃত্যের সংখ্যা ৪৫ লাখ ছাড়িয়ে যায়। পঞ্চাশের এই মন্বন্তর বাঙলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক প্রবল অভিঘাত। মন্বন্তরের পশ্চাদে প্রকৃতিসৃষ্ট ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণ ক্রিয়াশীল ছিল।

প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে প্রথমতঃ বলা যায় যে, ১৯৪২ সালে অনাবৃষ্টি এবং বর্ষা দেরীতে হয়। এতে ধান চাষে বিলম্ব ঘটে। পরবর্তীতে পূর্ব বাঙলার বন্যা এবং পশ্চিম বাঙলায় প্রবল ঘুর্ণিঝড় ও জ্বলোচ্ছাস হয়। মেদেনীপুর, চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার বিভিন্ন অঞ্চল এরফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চাষীর ঘরে সঞ্চিত শস্য জলে ভেসে যায়। প্লাবনের পর বিস্তীর্ণ এলাকায় ধানের চারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এতে ধানের উৎপাদন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ জনসংখ্যার তুলনায় এ বছর খাদ্যোৎপাদন হয় কম। প্রতি বছর তা যেখানে ৩৮ সপ্তাহের খাদ্য পাওয়া যেত, এ বছর সেখানে মাত্র ২৯ সপ্তাহের খাদ্য পাওয়া যায়। এর সঙ্গে আউশ ও বোরো এবং আমদানি করা শস্যের পরিমাণ যোগ করে বাঙলায় ৪৩ সপ্তাহের খাদ্য মজুত ছিল। অর্থাৎ সে সময় বাঙলায় মোট ১২ সপ্তাহের খাদ্য ঘাটতি ছিল।

প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও মনুষ্যসৃষ্ট কিছু কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। প্রথমতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে বাঙলায় বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ ঘটানো হয় এবং যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের জন্য কলকারখানায় বহিরাগত বহু শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। তাদের জন্য সরকার প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য বাজার দরের তুলনায় বেশি দামে কিনে নেয়। ফলে ব্যবসায়ীরা সরকারের কাছে খাদ্য-শস্য বিক্রি করে এবং দেশের খাদ্য শস্যের একটি বড় অংশ সৈন্যদের জন্য কিনে নেয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ জাপানি আক্রমণে ভীত হয়ে বার্মার লাখ লাখ মানুষ শরনার্থী হিসাবে বাঙলায় প্রবেশ করে খাদ্য সংকট বাড়িয়ে তোলে। ১৯৪২ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ৪০ হাজার শরনার্থী আশ্রয় নেয়। এ কারণেই চট্টগ্রামেই প্রথম দুর্ভিক্ষ শুরু হয়।

তৃতীয়তঃ সময়মত উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যশস্যের আমদানির অভাবে ঘাটতি পূরণ হয়না, ফলে মন্বন্তর তীব্র হয়ে ওঠে। চতুর্থতঃ যুদ্ধের সময় সরকারের পোড়ামাটি নীতি অনুসরণের ফলেও খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। জাপানি সৈন্যরা বাঙলায় প্রবেশ করে যাতে খাদ্য সংগ্রহ করতে না পারে সে জন্য সরকার চাষীদের ঘর থেকে খাদ্য সরিয়ে ফেলার লক্ষ্যে বাজার থেকে অধিক দরে চাল কিনে নেয়। কোথাও কোথাও জমির ধান নষ্ট করে ফেলা হয়। জাপানিদের যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টির

www.pathagar.com

জন্য ৬৬,৫৬৩টি নৌকা ভেঙ্গে ফেলা হয়। ৪,১৫৩ টি নৌকা জলে ডুবিয়ে দেয়া হয়। কিছু নৌকা সরকারী হেফাজতে রাখা হয়। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষের দিনে নৌকার অভাবে খাদ্যশস্য আনা-নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। পঞ্চমতঃ সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীরা আর্থিক মুনাফার লোভে খাদ্যশস্য মজুত করে এবং সেগুলি গোপনে বেশি দামে বিক্রি করতে থাকে। সৃষ্টি হয় কালোবাজার ও চোরাকাবারের। খাদ্যাভাব তীব্র হয়ে ওঠে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পশ্চাদে চোরাকারবারীদের অর্থগৃদ্ধতাই প্রধান কারণ ছিল। ষষ্ঠতঃ বাঙলা সরকার দেশে খাদ্যাভাবের কথা প্রথমে স্বীকারই করতে চায়নি। খাদ্যাভিযান ছিল ত্রুটিপূর্ণ। সরকারী খাদ্য বণ্টনে ছিল চরম অব্যবস্থা। তাছাড়া চোরাকারবারী দমনে সরকারের ব্যর্থতার ফলে খাদ্য সংকট চরমে ওঠে।

মন্বন্তরের প্রথম বিপর্যয় হল মহামারি। পথাশ্রয়ী অনাহারি মানুষেরা খাদ্যাভাবে এবং কুখাদ্য গ্রহণে নানা রোগের শিকার হয়। সর্বত্র রোগ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ওষুধের অভাবে চিকিৎসাকার্য ব্যাহত হতে থাকে। রোগাক্রান্ত অসংখ্য মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি অসুখ মহামারি আকার ধারণ করে। মহামারিতে অসখ্য লোক মারা যায়। মন্বন্তরজনিত বাঙলার অবস্থা হয়ে ওঠে ভয়ানক। পথ-প্রান্তর শবদেহে ঢেকে যায়। মৃত্যুদৃশ্যের করুণ ছবি জনমনে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মৃত ব্যক্তির সৎকার ও অসাধ্য হয়ে ওঠে। মৃত দেহ খালে, বিলে ও নদীতে ফেলে দেয়া হয়।

মন্বন্তরগ্রস্ত মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয়। বেচে থাকার সমস্যাই প্রধান হয়ে ওঠে। মানুষ স্বাভাবিক নীতিবোধ নিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। অনাহারের চাপে পিতা সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হয়, স্বামী স্ত্রীকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে নারী ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেয়। বহু নারী স্বেচ্ছায় বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে।

মন্বন্তরের সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার কর্মীরা মৃত্যুপথাযাত্রী মানুষের পাশে এসে দাড়ায়। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের বাঁচানোর জন্য অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র, প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নেতারা এক অভিযান পরিচালনা করে। সংগঠনের সদস্যরা বাস্তব ত্রাণের কাজে নেমে পড়ে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে সরকার যেসব লঙ্গর খানা খুলেছিল তার অনেকগুলিতে সংগঠনের সদস্যরা নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত ভাবে কাজ করেছেন।

শুধু দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকবেলায় নয়, কৃষক সভার ইতিহাসে আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে নালিতাবাড়ী সম্মেলন এক নতুন পরিস্থিতির সূচনা করে। নতুন কাজের ইঙ্গিত দেয় , কর্মী ও ভলান্টিয়ারদের মধ্যে নতুন উৎসাহ সৃষ্টি করে। এ

www.pathagar.com

ান্ত অনুসারে কৃষক কমিটি কর্মী শিক্ষার আয়োজন করে। এ উপলক্ষে তৈরী করা হয়। এ কোর্সে ছয়টি বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল। যথা - ১. বস্থা ও কৃষক আন্দোলনের শুরু, ২. কৃষক সভার বিকাশ, ৩. ফসল কৃষক সংক্রান্ত আইন, ৫. কৃষক সভার সংগঠন ও রাজনীনিত এবং ৬. গরুর চিকিৎসা। এছাড়া জাতীয় রাজনীতি ও পোস্টার লেখার কৌশল নিয়েও কোর্সে শিক্ষা দেয়া হয়। নেতৃস্থানীয় কর্মিরা এ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এই শিক্ষা কোর্স কৃষক আন্দোলন সংগঠনের অগ্রগতিতে বিশেষ সাহায্য করে।

১৯৪৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ। মন্বন্তর তখনও চলছে। কিন্তু এর মধ্যেই দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ীতে কৃষক সভার সপ্তম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে আবদুল্লাহ রুসল, গোপাল হালদার মনিসিংহ সভাপতিমন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। মনসুর হাবিবুল্লাহ সাধারণ সম্পাদক এবং বাগলাগুহ ও শ্যামা প্রসন্ন ভট্টাচার্য সহযোগী সম্পাদক নির্বাচিত হন। সম্পাদক মন্ডলীতে ছিলেন, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, রনধীর দাসগুপ্ত, শচীন্দ্র ঘোষ, সুধীর মুখার্জি প্রমুখ। এ সময় কৃষক সভার সদস্য সংখ্যা ছিল, ১,৭৮,৫০০ জন। ২৪টি জেলা থেকে এতে প্রায় চারশ প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলন উপলক্ষে ২মার্চ যে কৃষক সমাবেশ হয় তাতে দু'হাজার নারীসহ প্রায় ৩০ হাজার কৃষক সমবেত হয়। ৪৫০ জন কৃষকের একটি মিছিল ৮০ মাইল হেটে সম্মেলনে উপস্থিত হয়।

সম্মেলনে দুর্ভিক্ষ অবস্থায় কৃষকদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি বিতরণে দূর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা বন্ধের দাবী জানানো হয়। এছাড়া পাঁচ কোটি মণ চাল কিনে সর্বত্র রেশনিং ব্যবস্থা চালু এবং দুর্ভিক্ষের সময় যেসব কৃষকরা জমি হস্তান্তর করেছিল তা ফেরত দেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়। এ বছর লবণের ঘাটতির ফলে চোরাকারবারে লবন দু'টাকা থেকে আড়াই টাকা সের দরে বিক্রি হয়। কৃষক ভলান্টিয়ারদের দৈনন্দিন কাজ ছিল হাটে হাটে ও অন্যত্র চোরা লবণ ধরা। জমি ফেরত দেয়ার ব্যাপারে সরকার একটা অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল। এতে বলা হয় যে, দু'শ পঞ্চাশ টাকা ধরে যেসব জমি বিক্রি হয়েছে, ওই টাকা ফেরত দিলে কৃষক জমি ফেরত পাবে। কিন্তু টাকা ফেরত দেয়ার সামর্থ তখন খুব কম কৃষকেরই ছিল। ফলে হস্তান্তরিত জমির খুব সামান্যই ফেরত পাওয়া গিয়েছিল।

এ সময় বিভিন্ন জেলায় চালের দাম খুব বেড়ে যায়। কোন কোন স্থানে চাল ১৮ টাকা থেকে এক লাফে ৩০ টাকা মণ হয়ে যায়। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৃষক সভা কৃষক বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮ বছর বয়স্ক ও সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন কাজ করতে ইচ্ছুক যে কোন ব্যাক্তি কৃষক বাহিনীর সদস্য হতে পারত। প্রত্যেক গ্রামে অন্তত ১০ জন ভলান্টিয়ার নিয়ে একটি স্কোয়াড গঠন করা হয়।

www.pathagar.com

প্রত্যেক ইউনিয়নে ৩০, মহকুমায় ২১০ ও জেলায় ৫০০ ভলান্টিয়ার নিয়ে কৃষক বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভলান্টিয়ারদেরকে কাস্তে, হাতুড়ি চিহ্নিত ও 'কৃষক বাহিনী' লেখা ব্যাজ দেয়া হয়, এ সময় বাঙলায় অনেক জেলাতেই কৃষক আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে সংগীত, গণনাট্য, নাচ, গানের সংগঠন বা দল গড়ে তোলা হয়।

১৯৪৫ সালের ১৩-১৪ মার্চ বর্ধমান জেলার হাট গোবিন্দপুর কৃষক সভার অষ্টম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫টি জেলা থেকে ৩২৫ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনের সময় কৃষক সভার সদস্য সংখ্যা দাড়ায় ২,৫৫,১০৪ জনে। গোপাল হালদার, আবুল হায়াত, কৃষ্ণ বিনোদ রায় সভাপতিমন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। মনসুর হাবিবুল্লাহ সাধারণ সম্পাদক, বগলা গুহ ও অবনী লাহিড়ী যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। সম্পাদক মন্ডলীতে যারা ছিলেন তার মধ্যে রয়েছেন মুজাফফর আহদে, বঙ্কিম মুখার্জি, ভবানী সেন, বিভূতি গুহ, রনধীর দাসগুপ্ত, শচীন ঘোষ, সুধীর মুখার্জি, মনিসিং, আবদুর রাজ্জাক খা।

হাট গোবিন্দপুর সম্মেলনের পর কৃষকসভা ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে নেত্রকোণা জেলার নাগাড়ার মাঠে এক বিশাল কৃষক সমাবেশের আয়োজন করে। সম্মেলনের সাফল্যের জন্য জেলা কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার নেতৃবৃন্দ ঝাপিয়ে পড়েন। মাঠকে সারা ভারত কৃষক সমাবেশের উপযুক্ত করে তোলার জন্য মনিসিং, সুবিমল সেন, খুশু দত্ত রায়, শচীন চক্রবর্তী ও সুকুমার ভাওয়াল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দিনরাত পরিশ্রম করেন। সম্মেলনের কাজে শত শত হাজং যুবক এবং যুইফুল দত্ত, অঞ্জলি রায় ও নির্মলা সেনের নেতৃত্বে বহু মহিলা কর্মী দিনরাত পরিশ্রম করেন। সম্মেলন সফল করার জন্য জনগণের পক্ষ থেকে অনুকূল সাড়া ও পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার বাঁশ সংগ্রহ করা হয়। বাশ ও চাটাই দিয়ে তৈরি হয় সুদৃশ্য বক্তৃতা মঞ্চ। সভামন্ডল. প্রদর্শনী, স্টল প্রভৃতি নিয়ে ছোট্ট একটি সুন্দর শহর গড়ে ওঠে। মণিপুর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা এতে উপস্থিত ছিলেন। টাঙ্গাইল থেকে হাতেম আলী খানের নেতৃত্বে একদলৈ ভলান্টিয়ার সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে লাখো জনতা সম্মিলন ঘটে। এতে সভাপতিত্ব করেন কমরেড মুজাফফর আহমেদ। বক্তৃতা করেন পুরন চাঁদ যোশী, বঙ্কিম মুখার্জি, ভবানী সেন, সুন্দরাইয়া নাম্বদ্রিপদ, সোমনাথ লাহিড়ী, হরকিষান সিং, চন্দ্রিকা সিং, ইরাবত সিং, আবদুর রাজ্জাক খান, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, আবদুল্লাহ রসুল প্রমুখ। সমাবেশের ফলে সারা বাঙলায় কৃষকদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

নেত্রকোণা কৃষক সমাবেশ থেকে ফিরে এসে হাতেম আলী খান নিজ এলাকার কৃষকদেরকে জমিদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ শুরু করেন। ছাত্র ও যুবকদের মধ্য থেকে তিনি প্রত্যেক গ্রামে ১০ জন করে ভলান্টিয়ার নিয়ে একটি করে স্কোয়াড গঠন করেন। এই স্কোয়াডের নামকরণ করা হয় হোমগার্ড। হোমগার্ডের সদস্যদের নানা ধরণের অস্ত্রশস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাদের নিয়মিত কুচ-কাওয়াজে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। হোমগার্ডের কয়েকজন ক্যাপ্টেন ছিলেন, এরা হচ্ছে- খন্দকার গোলাম সরোয়ার (খামারপাড়া), ইউনুস আলী (শাখারিয়া), সামান আলী সরকার (উড়িয়াবাড়ী), সদর মৃধা, (কাহেতা), জমশের আকন্দ (ভোলার পাড়া)। হোমগার্ডের সর্বাধিনায়ক ছিলেন হাতেম আলী খানের ছোটভাই আবদুল লতিফ খান। তিনি বৃটিশ নৌ-বাহিনীর একজন (অবসরপ্রাপ্ত) সদস্য ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে হাতেম আলী খানের ডান হাত হিসাবে কাজ করেছেন। আবদুল লতিফ খান ছাড়াও হাতেম আলী খানের আরও এক ভাই তার বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন। তার নাম আবদুল জব্বার খান। এছাড়া তার অন্যান্য ভাইয়েরা সবাই তার কট্টর বিরোধী ছিলেন।

হাতেম আলী খান হেমনগর ও ধনবাড়ীর জমিদারদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গোপালপুর ও মধুপুর থানার বিভিন্ন গ্রামের কৃষকদের সংগঠিত করা শুরু করেন। ওইসব গ্রামের নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং পরামর্শ সভায় মিলিত হতেন। তাছাড়া, হোমগার্ডের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের পরামর্শ করার জন্য তিনি যোগীর গোপা নামে একটি জলবেষ্টিত দ্বীপের নির্জন স্থানে বৈঠক বসতেন। এসব বৈঠকে আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে আলোচনা করতেন। এ সময় কুমুল্লির জসিম চৌধুরী ছিলেন তার অর্থ সচিব। বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে যে অর্থের প্রয়োজন হত জসিম চৌধুরী সে অর্থের যোগান দিতেন। হাতেম আলী খান এভাবে জমিদারদের ওপর মরণাঘাত হানার জন্য শেষ সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সালের ২১-২৪ মে খুলনা জেলার মৌভাগে কৃষক সভার নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কৃষ্ণ বিনোদ রায় সভাপতি এবং মনসুর হাবিবুল্লাহ সাধারণ সম্পাদক হন। বগলা গুহ ও অবনী লাহিড়ী যুগ্ম সম্পাদক নির্বাজিত হন। সম্মেলনে প্রধান প্রস্তাব ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ। সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হয় যে, যত শিগগির সম্ভব ভাগচাষীদের তিনভাগের দুভাগের অধিকার দিয়ে অথবা চাষের সমস্ত খরচের অর্ধেক বহন করলেই মালিক ফসলের অর্ধেক ভাগ পাবে। এই মর্মে আইন হওয়ার প্রয়োজন। বাঙলার কৃষকদের

www.pathagar.com

মধ্যে একদিকে কমিউনিস্ট পার্টি অন্যা দিকে কৃষক সভার তৎপরতার ফলে বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ জেলার গণভিত্তিক সম্পূর্ণ কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে। এ সময়ে টাঙ্গাইলের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে গোপালপুর ও মধুপুর অঞ্চলে হাতেম আলী খান একটি শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে অবিভক্ত বাঙলার প্রায় ষাট লাখ ভাগচাষী তেভাগার দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৯টি জেলায় এই আন্দেলন চলে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টি ছিল এ আন্দোলনের প্রধান চালিকা শক্তি। কৃষক সভার নির্দেশে হাতেম আলী খান তার এলাকায় তেভাগা আন্দোলন শুরু করেন। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য স্থানীয় কৃষক নেতারা সক্রিয় হয়ে উঠেন। নিজ খোলানে ধান তোলার জন্য ভলান্টিয়াররা কৃষকদের পাশে থেকে তাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে থাকে। ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে সঙ্গে হোমগার্ডের সদস্যরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কোথাও কোন জাতদার বা জমিদার কৃষকের ওপর শক্তি প্রয়োগ করলেই হোমগার্ডের সদস্যরা দলে দলে সেখানে গিয়ে হাজির হতেন। হাতেম আলী খানের অক্লান্ত পরিশ্রমে টাঙ্গাইলের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে গোপালপুর ও মধুপুরে তেভাগা আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে টাঙ্গাইলের মহকুমা প্রশাসকের মধ্যস্থতায় কৃষক ও জমিদার পক্ষের মধ্যে একটি আপোষ করা হয়। ফলে আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে। টাঙ্গাইলে তেভাগা আন্দোলন সফল হওয়ার পর হাতেম আলী খান রংপুর, দিনাজপুর, রায়পুর ও মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন সংগঠনে কাজ করেন।

টাঙ্গাইল মহকুমার থেকে তেভাগার উত্তাপ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই পাকিস্তান আন্দোলনে উত্তাল অভিঘাত গোটা অঞ্চলকে কাঁপিয়ে দেয়। ইতিপুর্বে পূরণচাদ যোশী, ও বঙ্কিম মূখার্জি সহ কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কয়েকজন নেতা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে ন্যাশনাল মাইনরিটির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বলে স্বীকৃতি দেন। এ স্বীকৃতির ফলশ্রুতিতে হাতেম আলী খান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি এলাকার কৃষকদের পাকিস্তান আন্দোলনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু হেমনগরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরি এ সময় মুসলমান প্রজাদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। ৪৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে হেমচন্দ্র চেধুরী তার কাচারির সন্মুখস্থ বাজার থেকে দু'জন দোকানীকে জবরদস্তিমূলক ভাবে উচ্ছেদ করেন। হাতেম আলী খান উচ্ছেদকৃত প্রজাদের স্বপক্ষে দাঁড়ালেন। হাতেম আলী খান এলাকার কৃষকদের হেমনগর বাজার

www.pathagar.com

বর্জনের নির্দেশ দিলেন। শুধু তাই নয়, হেমনগর বাজারের অদূরে তিনি একটি নতুন বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে জমিদার বাড়ীর কাচারি সন্মুখস্ত বাজারটি বন্ধ হয়ে যায়।

এমনিতেই জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কংগ্রেসের সমর্থক এবং পাকিস্তান আন্দোলন বিরোধী। তদপুরি নিজ কাচারির সম্মুখস্থ বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক মুসলমান প্রজাদের ওপর তিনি ভীষণ ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি প্রজাদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান ও নতুন বাজারটি বন্ধ করার জন্য পাইক পেয়াদা ও বরকন্দাজদের লেলিয়ে দেন। সাধারণ প্রজা ও কৃষকরাও জমিদারের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ফলে উভয়পক্ষে কয়েকবার তুমুল সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় লোকেরা লাঠি, সড়কি, বল্লম, দা ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জমিদার বাড়ী আক্রমণ করে। তারা কাচারি বাড়ী আক্রমণ করে জমিদারের কাগজপত্র সব ছিনিয়ে আনে। কাচারির নায়েব ও পাইক পেয়াদা ও বরকন্দাজদের বেদম প্রহার করে। এ ব্যাপারে হোমগার্ডের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী এ ব্যপারে বাদী হয়ে হাতেম আলী খানসহ মোট সাত জনকে আসামী করে টাঙ্গাইল মহকুমা সদরে ৩৯ টি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু মামলায় মহকুমা সদরের সব উকিল-মোক্তার হেমচন্দ্র চৌধুরীর স্বপক্ষে এবং হাতেম আলী খানের বিপক্ষে মামলা লড়তে অস্বীকার করেন। অন্যদিকে আসামীদের বিরুদ্ধে এলাকার কেউ স্বাক্ষী দিতেও রাজী হয়নি। ফলে মামলাগুলি এমনিতেই খারিজ হয়ে যায়। এ ঘটনায় স্থানীয় প্রজারা জমিদারের ওপর ভীষণ ক্ষুদ্ধ হয়। তারা জমিদার বাড়ীতে ঘন ঘন সশস্ত্র হামলা চালাতে থাকে। ফলে জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী জমিদারী এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। তিনি এলাকা ছেড়ে কলকাতা চলে যাওয়ার কিছু দিন পরই ভারত বিভক্ত হয় এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত বিভক্তির পূর্বে ওই বছর ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ মেদেনীপুর জেলার পাঁচখুরিতে কৃষক সভার দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কৃষ্ণবিনোদ রায় সভাপতি এবং মনসুর হাবিবুল্লাহ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় কৃষক সভার প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ছিল ২, ০৩, ৩৮২ জন। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গের সদস্য সংখ্যা ছিল ১, ০১, ৩৮২ জন। দেশ বিভাগের পর কৃষক আন্দোলনে অনেক পরিবর্তন ঘটে। পূর্ববঙ্গ থেকে কৃষক সভার বহু হিন্দু কর্মী ও নেতা পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। নতুন পরিস্থিতিতে অনেক নেতা আন্দোলনে সক্রিয় থাকতে পারেন নি। স্বাধীনতার পূর্বে কৃষকদের দাবী ছিল পরিস্কার, তারা চেয়েছিলেন

www.pathagar.com

বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে বিনামূল্যে তাদের মধ্যে জমি বন্টন করা হবে। ভাগচাষীদের তেভাগা, পাটের ন্যায্যমূল্য ধার্য, মহাজনীঋণ মওকুফ, দ্রব্যমূল্য হ্রাস, কালোবাজারি মুনাফাখোরি বন্ধ এবং খাদ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। কিন্তু দেশ বিভক্তির পরও পূর্ববাঙলায় প্রাক পুঁজিবাদী ভূমিব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হল না।

www.pathagar.com

চার ঃ কৃষক সমিতি গঠন

দেশ বিভাগের প্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ১৬-১৭ জানুয়ারি কৃষক সভাকে নতুনভাবে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুসারে বঙ্গীয় কৃষক সভাকে দুভাগে ভাগ করা হয়। পূর্ববঙ্গে গঠিত কৃষক সভার নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি। কৃষক সভার সদস্যরা সুবিধামত স্থানে মিলিত হয়ে নতুন কৃষক কাউন্সিল গঠন করেন। এরজন্য মনসুর হাবিবুল্লাহকে আহবায়ক মনোনীত করা হয়। পরে কৃষক সভা এক আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর কৃষ্ণবিনোদ রায়কে সভাপতি ও মনসুর হাবিবুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির কাজ শুরু করে।

কৃষক সমিতি পূনর্গঠনের পর ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে লালমনিরহাট অঞ্চলে পূর্ববঙ্গের সমস্ত জেলা প্রতিনিধিদের একটা সম্মেলন হয়। কৃষক সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের ওপর মুসলিম লীগ সরকার ব্যাপক অত্যাচার নির্যাতন ও ধরপাকড় চালাতে শুরু করে। এজন্য কৃষক সমিতির এ সম্মেলন অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিন স্থায়ী এ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এতে বলা হয় ১. নবাব জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত মুসলিম লীগ সরকার স্বেচ্ছায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করবে না। কাজেই কৃষি প্রধান পূর্ববাঙলার গণআন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমেই চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে হবে। ২. সবচেয়ে সংগঠিত কৃষক অঞ্চলগুলি থেকে আন্দোলনের ঢেউ তুলতে হবে এং একবার ঢেউ উঠলে পূর্ববাঙলার সর্বত্র সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কৃষক সমিতি দেশব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত না করে কতগুলি নিদিষ্ট এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে এবং সারা দেশের কৃষকদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করে।

কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি সে সময় 'ইয়ে আজাদিঝুটা হ্যায়' ধ্বনি তুলে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র উচ্ছেদ করার আহবান নিয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত হয়। এ আহবান ব্যাপক জনগণের মধ্যে কোন অনুকুল সাড়া জাগায়নি, উপরন্তু তাদেরকে কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাবাপন্ন করে তোলে। জনগণের শত্রু মুসলিম লীগ সরকার সে সুযোগ অবহেলা না করে তাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে কমিউনিস্টদেরকে হিন্দু ও ভারতের এজেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করে। এর ফলে কমিউনিস্টরা ব্যাপক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কারণ কৃষক সমিতি যে সমস্ত এলাকায় ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সালে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত ও পরিচালনা করে সেগুলি ছিল আদিবাসী নমশূদ্র ও সাওতাল অধ্যুষিত

www.pathagar.com

এলাকা। অথচ স্বাধীনতার পর থেকেই পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ কৃষক নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল। কিন্তু কৃষক সমিতি ওইসব কৃষকদের সংগ্রামে সম্পৃক্ত করতে পারেনি।

১৯৪৭ সাল থেকেই দেশে খাদ্য সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কৃষকরা দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, খাজনার নির্যাতনে জর্জরিত হতে থাকে। সরকারি খাদ্য নীতির ফলে কর্ডন ও লেভির অত্যাচারও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাপড়, কেরোসিন, ভোজ্য তেল ইত্যাদির দুস্প্রাপ্যতা ও দূর্মূল্যের কারণে জনগণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কৃষক সমিতি এসব ইস্যুকে তখন সঠিকাভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। কৃষক সমিতির এই ব্যর্থতা হাতেম আলী খানের দৃষ্টি এড়ায়না।

স্মরণযোগ্য ত্যাগী নেতা হাতেম আলী খান ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হন। তখন থেকেই তিন কৃষক ফ্রন্টকে কাজের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন। কলকাতায় ছাত্র অবস্থায়ই তিনি কমরেড মুজাফফর আহমেদ, অমৃত ডাঙ্গে, আবদুল হালিম, পূরনচাঁদ যোশী, বঙ্কিম মুখার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। কৃষক সভার সদস্য হিসাবে কাজ করার সময় মনসুর হাবিবুল্লাহ, হাজী মহম্মদ দানেশ, মনিসিং, জিতেন ঘোষ, মনিকৃষ্ণ সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে কাজ করেন। ৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর সরকার প্রচণ্ড দমননীতি চালায়। মুল উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্মূল করে দেয়া। মুসলিম লীগ সরকারের চণ্ড দমননীতির জন্য কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সদস্য তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান। কিন্তু হাতেম আলী খান এ সময় আন্ডারগ্রাউন্ডে না গিয়ে প্রকাশ্য গণসংগঠনের সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে সুদৃঢ় যোগাযোগ গড়ে তোলেন। এর আগে চল্লিশের দশকের প্রথম পাদেই মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১৯৫০ সালে ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাঙলায় এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। বাগেরহাটের কালশিরা গ্রামে প্রথম দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। একজন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে একদল আনসার ওই গ্রামের এক হিন্দু বাড়িতে হানা দেয়। খানাতল্লাশির নামে একজন আনসার বাড়ির একজন মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। এতে ওই বাড়ি এবং গ্রামের কিছু হিন্দু লোক উত্তেজিত হয়ে আনসারকে মারপিট করে। ফলে গ্রামের হিন্দু অধিবাসি ও আনসারদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষ ক্রমে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় পর্যবেশিত হয়। মুসলিম লীগ সরকার দাঙ্গাকে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। ফলে ঢাকা, বগুড়া, শান্তাহার ও বরিশাল এই সব স্থানে দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

এ দাঙ্গার বদলা নেয়ার জন্য আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিম বঙ্গে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা বিভিন্ন স্থানে মুসলমান বিরোধী দাঙ্গার আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। ওই দাঙ্গার শিকার বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু পূর্ব-বঙ্গে চলে আসে। যে সব উদ্বাস্তু জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ও সরিষাবাড়ী ঘাট হয়ে পূর্ববঙ্গে চলে আসেন, তারা অধিকাংশই হেমনগর ইউনিয়নের ওপর দিয়ে অন্যত্র যেতেন। এখানে এসে তারা বিশ্রাম নিতেন। এক সময় এখানে এক সঙ্গে প্রায় বিশ হজার উদ্বাস্তু এক মাসে অবস্থান করে। হাতেম আলী খান তাদের সবার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ ঘটনা প্রতিপক্ষের একজন মহকুমা সদরে জানালে টাঙ্গাইল থেকে পুলিশ আসে ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য। কিন্তু হাতেম আলী খান উদ্বাস্তুদের জন্য যে আন্তরিকতা আতিথেয়তা ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তা দেখে পুলিশ ও সরকারি কর্মচারীরা খুশি হন। এ সম্পর্কে তারা কোন কথা না বলে চলে যান। এ সময় যারাই তাকে উদ্বাস্তুদের পাশে দেখেছে তারাই আর্ত-অসহায় মানুষের প্রতি তার দরদ দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

www.pathagar.com

পাঁচ ঃ নানা মুখী রাজনীতি

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজবুর রহমান, শাসুল হক প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ও সরকারের গণবিরোধী কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ওই দলে যোগদান করেন। দেশে গণতান্ত্রিকধারা বিকাশের ইতিহাসে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের এক বছর পর ১৯৫০ সালে মাওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের জন্য ময়মনসিংহে আসেন। এই দুই নেতা ময়মনসিংহে আসার পূর্বে হাতেম আলী খানকে তাদের সাথে সেখানে মিলিত হওয়ার জন্য সংবাদ পাঠানো হয়। তিনি ময়মনসিংহে গিয়ে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ময়মনসিংহে ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী জেলা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর টাঙ্গাইলে মহকুমা আওয়ামী লীগ গঠনের দায়িত্ব হাতেম আলী খানের ওপর অর্পণ করেন। হাতেম আলী খানের অক্লান্ত চেষ্টায় খুব অল্প সময়ে টাঙ্গাইলে আওয়ামী লীগ একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়।

অন্যদিকে ১৯৪৯-৫০ সালের মধ্যে তেভাগা. টংক ও নানকার আন্দোলনের ওপর মুসলিম লীগ সরকারের সীমাহীন নির্যাতন নিপীড়নে এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে পার্টি অতিবাম বিচ্যুতির ফলে কৃষক সংগঠনের কাজকর্মে ভাটা পড়ে। তারপরও এ সময় নুরুল আমীনের অসংখ্য খারাপ কাজের মধ্যে একটি ভাল কাজ হচ্ছে ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ। ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এদেশে কৃষক জমিতে স্বত্ব হারায় এবং জমিদাররা জমির মালিকে পরিণত হয়। পূর্ব বাঙলায় কৃষককূলের ওপর জমিদারদের অত্যাচার নির্যাতন ও নির্মম শোষণের কাহিনী ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। ১৮৫৯ সালে খাজনা আইন, ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন, ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন পাশ করে জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ ও কৃষককে জমিতে অধিকার ফিরিয়ে দেবার কিছু প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু জমিদারি প্রথা বিলোপ ছাড়া কৃষককে তার জমিতে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব ছিল না। যে কোন ভূমি সংস্কারের বিরুদ্ধে জমিদারদের চাপ ছিল। তাই ১৯৪০ সালে ফজলুল হকের সরকার স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে একটি ভূমি রাজস্ব কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের নাম করা হয় 'ফ্লাউড কমিশন'। কমিশন তার রিপোর্টে ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে জমিদারি ব্যবস্থা বিলোপ করার সুপারিশ করে। কিন্তু ১৯৪০ সাল থেকে পূর্ব বাঙলায় সরকার পরিবর্তন এবং স্বাধীনতার

www.pathagar.com

আন্দোলন জোরদার হওয়ার কারণে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৯৪৬-৪৭ সালে বাঙলায় তেভাগা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে সরকার 'বঙ্গীয় বর্গাদার নিয়ন্ত্রণ' বিল ১৯৪৭ নামে একটি বিল প্রাদেশিক আইন পরিষদে উত্থাপন করে। এই বিলে বর্গাচাষীকে ফসলের অর্ধেকের পরিবর্তে দুই তৃতীয়াংশ ভাগ দেয়ার এবং কিছু প্রজাস্বত্ব সংশোধনের সুপারিশ করে। কিন্তু তেভাগা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলে বিলটি চাপা পড়ে যায়। ১৯৪৮ সালে এপ্রিলে পূর্ব বাঙলা সরকার আইন সভায় 'পূর্ব বাঙলা জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব' বিল উপস্থাপন করে। প্রায় দু'বছর নানা বিতর্কের পর ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে এ বিলটি আংশিক সংশোধন করে পাশ করা হয় এবং তা আইনে পরিণত হয়।

১৯৫০ সালে 'পূর্ববঙ্গে যাবতীয় জমিদারি হুকুম দখল ও প্রজাস্বত্ব' আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হচ্ছে - ১. খাজনাভোগী সমস্ত জমিদারি ও মধ্যস্বত্ব অধিকারের অবসান এবং সরকার কর্তৃক এ জাতীয় সমস্তজমির দখল গ্রহণ, ২. সরাসরি সরকারের অধীনে সকল প্রজাকে জমির প্রকৃত দখল প্রদান, ৩. ভবিষ্যতে জমিতে কোন প্রকারের উপস্বত্বের সৃষ্টি কিংবা পত্তন দেয়া বা খাজনার বন্দোবস্ত দেয়া নিষিদ্ধকরণ, ৪. জোত-জমির সর্বোচ্চ সীমা ৩৩ একর নির্ধারণ, এর অতিরিক্ত জমি থাকলে তা অধিগ্রহণ করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করতে হবে, ৫. ফসল খাজনা যা ময়মনসিংহে টংক নামে এবং মজুরিবিহীন শ্রম যা সিলেটে নানকার নামে পরিচিত ওইসব প্রথা বাতিল করা হয়।

পূর্ব বাঙলায় ৭৬ শতাংশ জমি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায়। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সময় মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল আট কোটি বিয়াল্লিশ লাখ টাকা। জমিদারদের কাছ থেকে সরকারের প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ ছিল দুই কোটি পঁচিশ লাখ টাকা। রাজস্ব আদায়ে সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকা। ১৯৭০ সালে সরকারী রাজস্বের পরিমাণ দাড়ায় আঠার কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা। মাত্র বিশ বছরে এই বিপুল পরিমাণ রাজস্ব বৃদ্ধির খেসারত বাঙলার কৃষকদেরকেই দিতে হয়েছে। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কিছু ইতিবাচক দিক ছিল। কিন্তু এ আইন ধনতান্ত্রিক কৃষি কাঠামোর মূলে কোন আঘাত হানতে পারেনি। ফলে সামন্ততান্ত্রিক শাসনের জের এ দেশে থেকেই যায়। ক্ষতিপূরণ দিয়েই জমিদারি নেয়া হয়। ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ ছিল ত্রিশ কোটি টাকা। এ টাকা কিস্তিতে পয়তাল্লিশ বছরে পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।

জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর ১৯৫১ সাল থেকে কৃষকদের নতুন নতুন দাবী নিয়ে আন্দোলন করার জন্য কৃষক সমিতির পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ

www.pathagar.com

সময়ে মাওলানা ভাসানীকে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু মাওলানা ভাসানী জাতীয় রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৫৩ সালে কৃষক সমিতি পুনর্গঠন করা হয়। মাওলানা আবদুর রশিদ সংগঠনের সভাপতি ও মহিউদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। হাতেম আলী খান কৃষক সমিতির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের সাথে সম্পৃক্ততা সত্বেও দু'টি কারণে তিনি কৃষক সমিতির দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসেন। প্রথমত ঃ মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এ দায়িত্ব গ্রহণে তাকে উৎসাহিত করেন। কারণ তিনি ছিলেন ভাসানীর প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত ঃ তার রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষক সম্প্রদায়। তার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও স্বপ্ন ছিল বাঙলার দুখী কৃষকের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের। তাই কৃষক সমিতি গঠনের সময় তিনি স্বতঃস্ফুর্তভাবেই এ দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসেন।

একদিকে সাংগঠনিক তৎপরতা ও কর্মদক্ষতা অন্যদিকে মাওলানা ভাসানীর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে হাতেম আলী খান ১৯৫৪ সালে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনী ঘোষণা দেয়া হয়। '৫৪ সালের ওই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটানোর উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতান্ত্রিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম মিলে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি নির্বাচনী আতাঁত গড়ে তোলে। চুয়ান্নর নির্বাচন সার্বজনীন ভোটে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী আন্দোলনে তিন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন - শেরে বাঙলা একে ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী। ২১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

চুয়ান্নর নির্বাচন ছিল এক অবিস্মরণীয় রাজনৈতিক ঘটনা। স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকারের ওপর সাধারণ মানুষ এতটাই ক্ষিপ্ত ছিল যে, নির্বাচনী অভিযান শুরু হওয়া মাত্র যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে এক ব্যাপক গণজাগরণের সৃষ্টি হয়। পূব-বঙ্গের সকল স্তরের মানুষ যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে এগিয়ে আসে। এরই পরিণতিতে নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। মুসলিম লীগ এ নির্বাচনে মোট তিনশ নয়টি আসনের মধ্যে মাত্র নয়টি আসন পায়। অবশিষ্ট আসনের যুক্তফ্রন্ট ও ফ্রন্টের বাইরে সমর্থক দলের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়। এ নির্বাচনে হামেত আলী খান যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে গোপালপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন - প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ ও খন্দকার আবদুস সামাদ। নির্বাচনে হাতেম আলী খান বিপুল ভোটে বিজয়ী হন।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্টের অভাবিত বিজয়ে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর প্রমাদ গোণে। এ বিজয়কে নস্যাৎ করার জন্য কায়েমী স্বার্থবাদীরা চক্রান্তে লিপ্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদের অনুগত পাকিস্তানী কেন্দ্রিয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে জব্দ করার মতলব আটতে থাকে। এদিকে শেরে বাঙলা ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর তাকে মন্ত্রি পরিষদ গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ১৯৫৪ সালে ২ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় কেন্দ্রিয় সরকার ও এখানকার অবাঙালি মিল মালিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকেই মুসলিম লীগ সরকারকে এরা টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। কাড়িকাড়ি অর্থ ব্যয় করেছে। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হবার উপক্রম হচ্ছে দেখে ফাঁক খুঁজতে থাকে। এদিকে পূর্ব বঙ্গে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তাই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে উচ্ছেদ করার জন্য পাকিস্তানি কেন্দ্রিয় শাসকগোষ্ঠির চক্রান্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাও এগিয়ে আসে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্মিলিত চক্রান্ত শুরু হয়।

পাকিস্তানের তদানিন্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিলড্রেথ প্রকাশ্যে কেন্দ্রিয় মুসলিম লীগ সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। নির্বাচনের পরে পূর্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেন্দ্রিয় মুসলিম লীগ সরকারের পদত্যাগের জন্য জোর দাবি তোলা হয়। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলেরও দাবি জানানো হয়। এ সম্পর্কে হিলড্রেথ এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলেন যে, পূর্ব-বঙ্গে নির্বাচন ছিল নেহায়েত একটি প্রাদেশিক ব্যাপার। এর জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের পদত্যাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ নির্বাচনে পূর্ব-বঙ্গের জনগণ পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধেও কোন রায় দেয়নি। সারা দেশের মানুষ হিলড্রেথের ওই স্পর্ধিত উক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এ সময় সরকারের দালালেরা চন্দ্রঘোনা কাগজের কলে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়। এর কিছুদিন পর আদমজি চটকলেও বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। দাঙ্গার উন্মত্ত তাণ্ডবে বহু শ্রমিক নিহত হয়। সারা পূর্ব-বঙ্গ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব-বঙ্গের নেতৃবৃন্দ তখন প্রতিক্রিয়াশীলদের ওইসব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। চক্রান্ত অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

এ সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম মুখপাত্র 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স' - এ ফজলুল হকের একটি বক্তৃতা বিকৃতভাবে পরিবেশন করা হয়। তাতে বলা হয় যে, ফজলুল হক পূর্ব-বঙ্গকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের সাথে মিলিয়ে দিতে

www.pathagar.com

চেয়েছেন। ফজলুল হক ওই সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানান। কিন্তু দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীরা ওই প্রতিবাদে কোন কর্ণপাত করেনি। বিকৃত সংবাদের সূত্র ধরেই ফজলুল হককে 'দেশদ্রোহী', 'ভারতের দালাল' হিসাবে আখ্যায়িত করে। নানা মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করিয়ে ১৯৫৪ সালে ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করে। কেন্দ্রিয় সরকার পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর চৌধুরী খালেকুজ্জামানকে অপসারণ করে সেস্থানে কুখ্যাত সামরিক অফিসার মেজর জেনারেল ইসকান্দর মির্জাকে গভর্ণর করে পাঠায়। সেই সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারি করে প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতার করে। এ সময় সংগ্রামী নেতা হাতেম আলী খানকেও তারা গ্রেফতার করে।

চুয়ান্ন সালের নির্বাচনের পর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকারের তীব্র দমন নীতির জন্য পূর্ব-বঙ্গে গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক জীবন সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আওয়ামী মুসলিম লীগ ও গণতন্ত্রী দলের প্রায় সব নেতা-কর্মীই কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী চিকিৎসার জন্য বিদেশে চলে যান। ৪ জুলাই কমিনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অনেক নেতা-কর্মী আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যান। গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে বলপ্রয়োগে দমন করে পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় শাসকগোষ্ঠী মাকিন-ব্রিটিশ প্রভৃতি সামরাজ্যবাদীদের সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় সামরিক জোটে ও বাগদাদ প্যাক্টে যোগ দেয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় সামরিক জোট (সিয়াটো) পাকিস্তান যোগ দিয়েছিল ১৯৫৪ সালে ৮ সেপ্টেম্বর, বাগদাদ চুক্তিতে সই করেছিল ১৯৫৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। পশ্চিমা সাম্যাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনার অঙ্গরূপে ওইসব সামরিক জোট বেঁধেছিল। অবশ্য এর আগেও প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনার জন্য একটি চুক্তি করেছিল। ওই বছর কোরিয়াতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ সমর্থন করেছিল। ১৯৫২ সালে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে মার্কিনীদের হাতের পুতুল বাওদাও-এর সরকারকে সমর্থন করে। অথচ কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলি আত্মঘাতি ওই বিদেশ নীতির বিরুদ্ধে সব সময় সংগ্রাম করেছে। হাতেম আলী খান আওয়ামী মুসলিম লীগের একজন নেতা হয়েও ওইসব প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সব সময় সংগ্রাম করেছেন, সোচ্চার থেকেছেন। এ ব্যাপারে সব সময় তিনি পুরোপুরি ভাসানীর অনুসারী ছিলেন।

১৯৫৫ সালের ৬ জুন কেন্দ্রিয় সরকার কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারকে পূর্ব-বাঙলায় মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি দেয়। তার সরকারের সময় পূর্ব-

www.pathagar.com

বঙ্গে খাদ্য সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। সরকারের মজুদ চাল নিয়ে তিনি নজীরবিহীন দূর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সরকারি চালের মজুদ থেকে ১০ টাকা মণ দরে পারমিট বিক্রির ব্যবস্থা করেন। নিজ দলের গণপরিষদ সদস্যদের কাছে তিনি এ পারমিট বিক্রি করেন। পারমিটপ্রাপ্ত সদস্যরা ১০ টাকা মণ চাল কিনে নিয়ে ৩০ টাকা মণ দরে বিক্রি করেন। মন্ত্রিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তিনি প্রচুর লাইসেন্সও বিতরণ করেন। সরকারি পারমিট মারফত সস্তা দরে চাল ক্রয় করে পরে তা তিন-চারগুণ বেশি দরে বিক্রি করে অনেকে রাতারাতি বিত্তবান হয়ে ওঠেন। খাদ্য-সংকট চরমে ওঠে।

সারা বাঙলায় খাদ্য-সংকট চরম আকার ধারণ করলে আওয়ামী লীগ প্রচণ্ড গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। বাধ্য হয়ে কেন্দ্রিয় সরকার পূর্ব-বাঙলায় আরো খাদ্য কেনার জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে এবং বিরোধী দলের প্রতিনিধি সমন্নয়ে 'সুপ্রিম ফুড কাউন্সিল' গঠনে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় ১৯৫৬ সালের ৪ আগস্ট আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীতে নিরন্ন মানুষের এক ভূখা মিছিল বের হয়। পুলিশ মিছিলকারীদের বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অবশেষে পুলিশ মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। এতে একজন কৃষক মারা যায় এবং অনেকে আহত হয়। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এ মিছিল বের হয়। মিছিলের সংগঠকদের মধ্যে হাতেম আলী খান ছিলেন অন্যতম । ভুখা মিছিল সংগঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫৬ সালের ৩০ আগস্ট আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। কোয়ালিশন সরকারের মূখ্যমন্ত্রি হন আতাউর রহমান খান। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠনের পাঁচ দিন পর কেন্দ্রেও আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রি হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী । কেন্দ্রে ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সরকার গৃহিত বিভিন্ন নীতির প্রশ্নে পার্টির অভ্যন্তরে কোন্দল দেখা দেয়। ভাসানীর নেতৃত্বে পার্টির একটি অংশ সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্র নীতি এবং পূর্ব-বাঙলা সরকারের লাইসেন্স পারমিট বিতরণ নীতির কঠোর সমালোচনা শুরু করেন। মাওলানা ভাসানী প্রকাশ্যে বলেন যে, আওয়ামী লীগ সরকার যে পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করেছে তা পার্টির মেনিফেস্টো বিরোধী। এভাবে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে একটি ভিন্নমতালম্বী গ্রুপের সৃষ্টি হতে থাকে। হাতেম আলী খান নিজেও এ গ্রুপের একজন ছিলেন। তিনি পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে মাওলানা ভাসানীকে সমর্থন করে।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি হওয়ার পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যেসব প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার মধ্যে ছিল সুয়েজ খাল জাতীয়করণ প্রশ্ন নিয়ে মিশরের ওপর ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ এবং ইজরাইলের মিলিত আগ্রাসনের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা সামরিক জোটগুলিকে সমর্থন করা। সিয়েটো ও বাগদাদ চুক্তিতে পাকিস্তানের যোগদানের পক্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়ানো। সোহরাওয়ার্দীর এই সাম্রাজ্যবাদ ঘেষা বিদেশনীতি পূর্ব-পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রধানমন্ত্রি সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচি বিরোধী কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ তখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এ জন্যই মাওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারিতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন। কাগমারি সম্মেলন সফল করার জন্য হাতেম আলী খান মাওলানা ভাসানীর পাশে গিয়ে দাঁড়ান। এ সম্মেলনে তিনি ছিলেন ভাসানীর একজন ঘনিষ্ট সহযোগী। কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনা ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব ছিল হাতেম আলী খানের ওপর।

কাগমারি সম্মেলন উপলক্ষে মহকুমা শহর টাঙ্গাইল নতুন সাজে সজ্জিত হয়। হাতেম আলী খানের সহযোগিতায় ভাসানীর অনুসারী ও মুরিদরা ঝোপ জঙ্গলে ভরা সন্তোষকে মাত্র তিন-চার দিনের মধ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলেন। ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকালে সন্তোষের নাট মন্দিরে শুরু হয় ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন। ৮৯৬ জন কাউন্সিলর কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদান করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন লুঙ্গি ও খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে মাথায় বেতের টুপি পরিহিত মাওলানা ভাসানী। পাশের আসনে বসেছিলেন স্যুট-টাই পরিহিত প্রধানমন্ত্রি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। মন্ত্রিদের পরণে ছিল কালো শেরোয়ানী ও চুড়িদার পায়জামা। তারা বসেছিলেন দলীয় কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বারান্দায় পৃথক সারিতে। কাউন্সিলরা বসেছিলেন উঠানের পাকা মেঝেতে। তাদের পরণে ছিল লুঙ্গি, পায়জামা ও পাঞ্জাবির মত দেশীয় পোষাক। শেষ মাঘের শীতে গায়ের ওপর চড়িয়ে নিয়েছিলেন খদ্দরের চাদর। এদের সারিতে বসেছিলেন হাতেম আলী খান। এ সারিতে বসে তিনি ভাবছিলেন একই রাজনৈতিক দলের কর্মী হলেও সরকারের অবস্থানকারীদের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য কত প্রকট। এক পর্যায়ে এ সম্মেলনে ভাসানীপন্থি ও ভাসানী বিরোধী এ উভয় গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। উত্তেজনা প্রশমন ও উভয়পক্ষকে ঠাণ্ডা রাখার ক্ষেত্রে হাতেম আলী খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এ সম্মেলনে হাতেম আলী খান উপলব্ধি করেন যে, নেতারা অতন্দ্র দৃষ্টি না রাখলে খুব শিগগির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু ডেকে আনে। ক্ষমতাসীনরা ভুল

www.pathagar.com

করলে জনগণ সে ভুল ক্ষমা করে না। তাই ক্ষমতা যাতে মাথা গুলিয়ে না দেয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। দেশ বিভক্তির পর লুট-পাটের যে চিত্র তা অতীতের সমস্ত রাজনৈতিক অসততা, দূর্নীতি ও চুরি-চামারিকে হার মানাবে। পূর্ব-বাঙলাকে লুণ্ঠনের জোয়ালে আবদ্ধ করে শাসকরা ক্ষমতার হাল ধরে আছে। সূতরাং পূর্ব-বাঙলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা করার জন্য নতুন রাজনীতি শুরু করার কোন বিকল্প নাই। তাই ১৯৫৭ সালের ২৪ জুলাই মাওলানা ভাসানী যখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন তখন দেশের প্রগতিশীল অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে হাতেম আলী খানও তাকে স্বাগত জানান।

www.pathagar.com

ছয় ঃ ন্যাপ ও কৃষক সমিতির বিভক্তি

আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেই মাওলানা ভাসানী সারা পাকিস্তান ভিত্তিক একটি প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। দল গঠনের প্রস্তুতি পর্বে মাওলানা ভাসানী দেশব্যাপী জনসভা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং জনমত গড়ে তোলেন। এ সময় যে কয়জন প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা তার সঙ্গে ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করেছেন হাতেম আলী খান তাদের অন্যতম। এ পরিকল্পনা অনুসারে ভাসানী পশ্চিম-পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের নেতা আবদুল গাফফার খান, পাঞ্জাবের মিয়া ইফতিখার উদ্দিন, মাহমুদ আলী কাসুরি, মাহমুদুল হক ওসমানি, আবদুল মজিদ সিন্ধি, জি,এম সৈয়দ ও গাউস বক্স বেজেঞ্জোসহ অনেক পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতাকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানান। স্থির হয় ২৬ ও ২৭ জুলাই (১৯৫৭) ঢাকার সদরঘাট রূপমহল সিনেমা হলে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং সম্মেলনে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা হবে।

সম্মেলনে দেশের প্রথম পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করা হয়। ন্যাপ গঠনের পর কমিউনিস্ট পার্টির অনেক প্রকাশ্য কর্মী, বিশেষ করে পার্টির যেসব সদস্য ও সমর্থক আওয়ামী লীগের কাজ করতেন তারা ন্যাপ -এ যোগ দিয়ে এর সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করেন। ন্যাপ-এর কেন্দ্রিয় কমিটির সভাপতি হন মাওলানা ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানি। এ সময় হাতেম আলী খান ন্যাপ -এর কেন্দ্রিয় নির্বাহ কমিটির সদস্য, ময়মনসিংহ জেলা ন্যাপ- এর সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য এবং টাঙ্গাইল মহকুমা ন্যাপ -এর সভাপতি হন।

ন্যাপ গঠনের পর বিপুল রাজনৈতিক সম্ভাবনার মুখে মাওলানা ভাসানী কৃষক সমিতি পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেন। এ সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে, সারা দেশে কৃষকরা দ্রুত জমি হারাচ্ছে ও ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়ে কাজের অভাবে বেকার ও অর্ধবেকারে পরিণত হয়েছে। ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, কাজ ও বাঁচার মত মজুরি যাদের আশু প্রয়োজন তারা কিছুই পাচ্ছে না। এ অবস্থায় তিনি একটি শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যদিও ইতিপূর্বে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় সারা দেশে প্রগতিশীল কর্মী শিবির গড়ে ওঠেছিল। যুক্তফ্রন্ট নেতাদের নীতি ও একুশ দফা বাস্তবায়নে তাদের ব্যর্থতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পর শ্রেণী সংগঠন গড়ে তোলার তাগিদ সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য মাওলানা ভাসানী ১৯৫৫ সালে সন্তোষে কৃষক-মজদুর কর্মী সম্মেলন আহবান করেন। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনে বাধা সৃষ্টির অজুহাতে কৃষক সমিতি গঠন বিলম্বিত হয়। ন্যাপ গঠনের পাঁচ মাস পরে ১৯৫৭ সালে ডিসেম্বরে ফুলছড়ি ঘাটে মাওলানা ভাসানী এক বিশাল কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্মেলনে কৃষক সমিতি পুনর্গঠন করা হয়। সম্মেলনে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও হাতেম আলী খানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

এ সময় মাওলানা ভাসানী হাতেম আলী খানকে সঙ্গে নিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত দু'টি সংগঠনের (ন্যাপ ও কৃষক সমিতির) সাংগঠনিক ভিত জোরদার করার জন্য পূর্ব-বাঙলার গ্রামে গ্রামে সফর ও সভা করা শুরু করেন। প্রতিটি জেলায় গিয়ে তারা ন্যাপ -এর প্রত্যেক কর্মীকে কৃষক সমিতি করার জন্য উদ্ধৃদ্ধ করেন। এ সময় তারা প্রায় সকল জেলাতেই কৃষক সম্মেলন অথবা সমাবেশ করেন। মাওলানা ভাসানী ও হাতেম আলী খানের অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ -এর কর্মীদের নিষ্ঠার ফলে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ছাড়া সকল জেলাতেই কৃষক সমিতির শাখা গড়ে ওঠে। এমনকি অধিকাংশ মহকুমা, থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কৃষক সমিতির অফিস খোলা হয়।

মাওলানা ভাসানী রাজনৈতিক কর্মকান্ড ছাড়াও জাতীয় নানা সমস্যা ও কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তার কাছে অসংখ্য মুরিদান বয়েত পড়তে আসতেন। এ সময় হাতেম আলী খান ভাসানীর কাছাকাছি থাকতেন এবং আগতদের কাছ থেকে কৃষক সমিতি করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতেন। ভাসানী প্রতিটি সভায় কৃষক-রাজ শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠার ডাক দিতেন। সাধারণ মানুষদেরকে তিনি দেশের জোতদার, মহাজন, মুনাফাখোর, ঘুষখোর সরকারি আমলাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উদ্ধুদ্ধ করতেন। ভাসানীর যোগ্য অনুসারি হিসাবে হাতেম আলী খান নিজেও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। কৃষকদের সামনে তাদের নিজস্ব দুঃখ, বেদনা ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরে তাদেরকে সচেতন করে তোলার কাজে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তার অক্লান্ত চেষ্টায় বিপুল সংখ্যক কৃষকের মধ্যে জঙ্গী মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

এদিকে কৃষক সমিতি পুনর্গঠনের মাত্র দশ মাস পরে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা মালিক ফিরোজ খানের সরকারকে উৎখাত করে দেশের সামরিক শাসন জারি করেন। ওই দিন এক ফরমান বলে তিনি পাকিস্তানের স্বশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান এক সরকারি আদেশ জারির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রির পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি বলেন

www.pathagar.com

যে, দেশের রাজনীতিবিদগণের ক্ষমতার লড়াই, স্বার্থান্ধতা, দুর্নীতি, দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা, দেশপ্রেমের অভাবের কারণে তারা জাতির জন্য কিছুই করতে পারে নি। তাছাড়া, চোরাচালান, মজুতদারি ইত্যাদির ফলে দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। সামরিক আইন জারির কয়েক মাসের মধ্যেই প্রায় একশ পঞ্চাশ জন সাবেক মন্ত্রি, প্রতিমন্ত্রি, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এবং প্রায় ছয়শ জন জাতীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যের বিরুদ্ধে দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উত্থাপন করেন। এ সময় সংবিধান স্থগিত রাখা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীসহ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বহু নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হয়। সাবেক গণপরিষদ সদস্য ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা হাতেম আলী খান এ সময় সামরিক সরকারের রোষানলে পতিত হন। গ্রেফতার এড়ানোর জন্য তিনি আত্মগোপন করেন। ফলে কৃষক সমিতির কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দেয়।

১৯৫৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর আইয়ুব খান রাজনৈতিক নেতাদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য 'এবডো' প্রথা চালু করেন। এর ফলে রাজনৈতিক নেতারা সাত বছর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এ অবস্থায় কৃষক সমিতির কার্যক্রম চালু করার সকল সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালে সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সাথে সাথে জিনিস-পত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যায়। এ সময় আইয়ুব খান ভূমি সংস্কারে হাত দেন। এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বলা হয় যে, পশ্চিম-পাকিস্তানে কেউ সেচযোগ্য জমি পাঁচশ একর এবং অসেচযোগ্য জমি একহাজার একরের বেশি রাখতে পারবে না। এ অধ্যাদেশের ফলে পশ্চিম-পাকিস্তানের বৃহৎ সামন্ত ভুস্বামীদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভব হয়। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এর উল্টো পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৫০ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে যে ভূমি সংস্কার করা হয় তাতে কেউ তেত্রিশ একরের বেশি জমি রাখার অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু আইয়ুব খান পূব-পাকিস্তানের জোতদারদের সমর্থন লাভ করার জন্য জমির সিলিং বাড়িয়ে তিনশ বিঘা করেন। আগের সিলিং অনুযায়ী যারা বাড়তি জমি সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সরকার পূনরায় তাদের সে জমি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

ক্ষমতায় এসেই আইয়ূব খাঁন গভীর অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হয় । এ সময় রফতানি বোনাস স্কীম চালু করা হয় । এর ফলে কৃষক সমাজ ও সাধারণ মানুষ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিদেশী রফতানিকারক শিল্পপতিরা এতে লাভবান হন । কেননা ওই রফতানি বোনাস স্কীমের অধীনে যেখানে বস্ত্র ও পাটজাত পণ্যের জন্য শতকরা ২০ ভাগ বোনাস ও অন্যান্য শিল্পজাত পণ্যের জন্য শতকরা ৪০ ভাগ

www.pathagar.com

বোনাসের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে পাট রফতানির জন্য কোন বোনাসের ব্যবস্থা ছিলনা। ফলে কৃষকরা এতে ক্ষতিগ্রস্থ হন। ক্ষমতায় আসার পর আইয়ুব খানের বিভিন্ন ধরনের গনবিরোধী কার্যক্রমের জন্য কৃষক শ্রমিকের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেধে ওঠে। ক্ষমতায় আসার মাত্র তিন মাস পরে আদমজী চট কলের ২৫ হাজার শ্রমিক সামরিক শাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ ও রোববার সাপ্তাহিক ছুটির দাবীতে ধর্মঘট আহবান করে। সামরিকজান্তা হ্রিংস দমন নীতি চালিয়ে শ্রমিক ধর্মঘট বন্ধ করে দেয়। সমরিক আইন জারির পর পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম-পাকিস্তানী পূজিপতিদের উপনিবেশিক শোষণ ও সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ বৃদ্বি পাওয়ার ফলে কৃষক-শ্রমিক মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, যুবকসহ বাঙালীদের ব্যাপক অংশের ভিতর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুব খান জনগণের আস্থাভোটে প্রহসনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাবলে দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। এরপর এপ্রিলে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচনী প্রহসন হয়। ১৯৬২ সালের ৮ জুন রাওয়ালপিন্ডিতে জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়।

'৬২ - এর ছাত্র সংগ্রামের প্রভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের শোষিত ও বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ভিতর যে জাগরণ এসেছিল, সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর তা প্রবল হয়। ১৯৬৩ সালের শুরুতেই শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। টঙ্গী ও অন্যান্য স্থানের সূতাকল শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে চল্লিশ দিনব্যাপী ধর্মঘট পালন করে। কর্ণফুলি কাগজের কলে শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট করে। ঢাকা-চট্টগ্রামের অন্যান্য শিল্পাঞ্চলেও মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে শ্রমিকরা সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকে। হাতেম আলী খান সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর রাজনৈতিক দল ও শ্রেণীসংগঠনগুলি পূনরুজ্জীবিত করার এ সুযোগে কৃষক সমিতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তৎপরতা শুরু করেন।

১৯৬৩ সালের জানুয়ারিতে তিনি আত্মগোপন অবস্থা থেকে বের হয়ে কাগমারিতে মাওলানা ভাসানীর কাছে চলে আসেন। এখানে তিনি একমাস অবস্থান করেন। এ সময় কৃষক সমিতির বহু জেলা প্রতিনিধি কাগমারিতে এসে ভাসানী ও হাতেম আলী খানের সঙ্গে দেখা করেন। জেলা প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের পর কৃষক সমিতির কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। হাতেম আলী খান কৃষক সমিতির লক্ষ্য ও দাবী-দাওয়া সম্বলিত একটি বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বিভিন্ন জেলায় তা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে তিনি দারুণ আবাসিক সংকটে নিপতিত হন। কারণ আত্মীয়-স্বজন বা

www.pathagar.com

পরিচিত কেউ তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। তাদের ভয় ছিল যে, এই বিপদজনক মানুষটিকে আশ্রয় দিলে পুলিশী হয়রানির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা যে কোন মুহূর্তে পুলিশ বাসা তল্লাশী করতে পারে। কোন উপায়ান্তর না দেখে তিনি ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ডে উদ্বাস্তুর মত দিনযাপন করতে থাকেন। কখনো আবার ভাসমান জনস্রোতের সঙ্গে ফুটপাতে আশ্রয় নিয়েছেন। এ অবস্থায় দশ মাস অতিবাহিত হয়। ১৯৬৩ সালের ১ নভেম্বর ঢাকায় কৃষক সমিতি 'চাষী দিবস' পালন করা হয়। এ বিশাল সমাবেশে হাজার হাজার কৃষক সমবেত হয়। এ সময় কৃষক সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় পঁচিশ হাজার।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে আসেন। জিতেন ঘোষ ও হাতেম আলী খান দু'জনে মিলিত প্রচেষ্ঠায় ওসমান গণি রোডে কৃষক সমিতির জন্য একটা বাসা ভাড়া নেন। দু'নেতা কিছুদিন এ ঘরেই বসবাস করেন। কিন্তু দু'মাস পর ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে কৃষক সমিতির ওসমান গণি রোডের বাসা ছেড়ে দিতে হয়। কাশ্মীরে হযরতবাল মসজিদ থেকে ইসলাম ধর্মের একটি পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন চুরি হয়ে যায়। এ ঘটনা উপলক্ষে আইয়ুব খান বেতারে এক প্ররোচনামূলক বক্তৃতা করেন। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানে, বিশেষ করে ঢাকা ও খুলনাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।

ঢাকায় কৃষক সমিতির অফিস ছেড়ে দেয়ার কিছুদিন পর হাতেম আলী খান একটি 'লিথো সাইক্লোস্টাইল প্রেস' নিয়ে টাঙ্গাইল যাচ্ছিলেন। এ সময় বাসস্ট্যান্ডে গোয়েন্দা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পরে তাকে পুলিশ সদর দফতরে দু'দিন আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর পুলিশ তাকে লালবাগ থানায় সাতদিন আটকে রাখে। থানায় পুলিশ তার ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। যার ফলে আমৃত্যু তিনি শারীরীক ব্যথায় ভুগেছেন। কিন্তু অত্যাচার, নির্যাতন, শারীরীক কষ্ট তাকে কখনো সাংগঠনিক দায়িত্ববোধ থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি।

১৯৬৪ সালের ২৭-২৮ এপ্রিল কৃষক সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাবনার লাহিড়ীমোহনপুরে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে পনরটি জেলা থেকে পনরশ প্রতিনিধি যোগদান করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন অমূল্য লাহিড়ী। এই সম্মেলনে মাওলানা ভাসানী সভাপতি এবং হাতেম আলী খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। লাহিড়ীমোহনপুরের সম্মেলনে পনর দফা দাবী তুলে ধরা হয়। এগুলি হচ্ছে - ১. একশ বিঘার পরিবর্তে তিনশ পচাত্তর বিঘা জমির যে সিলিং আইয়ুব খান নির্ধারিত করে দেন তা বাতিল করা এবং একশ বিঘার অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ করে তা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা, ২. সামন্তবাদী প্রথা সম্পূর্ণ বিলোপ করা,

www.pathagar.com

৩. স্বল্প সুদে সরকারি ঋণের ব্যবস্থা করা, ৪. আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যাপক প্রচলনের জন্য ভারি শিল্প কারখানা গড়ে তোলা, ৫. সাম্রাজ্যবাদীদের শর্তযুক্ত বৈদেশিক বাণিজ্য ও শিল্পচুক্তি পরিত্যাগ করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনসহ বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত করা, ৬. পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ৫০ টাকা ও আখের মূল্য মণপ্রতি চার টাকা ধার্য করা, ৭. সেচ সুবিধার উন্নতি সাধন করা, ৮. সার্টিফিকেট প্রথা রহিত করা, ৯. ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের বকেয়া খাজনা ঋণ, সুদ ও কর মওকুফ করা, ১০. সামরিক সরকার যেসব খাজনা ট্যাক্স বৃদ্ধি করেছে তা হ্রাস কার, ১১. উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করা, ১২. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করা, ১৩. হাট-বাজারে ইচ্ছা মাফিক খাজনা ও তোলা আদায় বন্ধ করা, ১৪. জেলে সম্প্রদায়ের জন্য সস্তা দরের সূতা, নৌকা তৈরী করার উপকরণ ও আলকাতরা সংগ্রহ করা, ১৫. তাঁতীদের জন্য সস্তা দরের সূতা ও রং সরবরাহ করা।

১৯৬৫ সালে আইয়ুব খান দ্বিতীয় বারের মত দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এসময় পূর্ব-পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী ও আইয়ুব স্বৈরশাসন বিরোধী জনগণ তথা সর্বস্তরের মেহনতি মানুষ তাদের বাঁচা-মরার সংগ্রামে উত্তোরোত্তর উত্তাল হয়ে ওঠেছিল। এসব আন্দোলনের মধ্যে ছিল সূতা ও চটকল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন, রেলওয়ে শ্রমিক লীগের আন্দোলন, ছাত্রদের শিক্ষা দিবসের আন্দোলন, চট্টগ্রামের শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ধর্মঘট এবং কৃষক সমিতির পনর দফা দাবী আদায়ের আন্দোলন। যতই দিন যাচ্ছিল আন্দোলনের গতিবেগ ততই বেড়ে যাচ্ছিল। এসব আন্দোলন কৌশলে দমনের জন্য তিনি একটা কৌশল উদ্ভাবনের তালে ছিলেন। তাই কাশ্মিরকে কেন্দ্র করে তিনি আগবাড়িয়ে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধের সময় হাতেম আলী খান সাংগঠনিক সফরে ময়মনসিংহ যান। জাতীয় নিরাপত্তার ধূয়া তুলে পুলিশ সেখানেই তাকে গ্রেফতার করে। কয়েক মাস পর হাইকোর্টে রিট আবেদনের মাধ্যমে তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হন

এ দিকে ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান ভারত সীমান্ত যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধ আন্ত র্জাতিক সমর্থন ও বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে পূর্ব-পাকিস্তানের জনপ্রিয় ও শক্তিশালী সংগঠন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (ন্যাপ) ভাঙ্গনের পালা শুরু হয়। পাক-ভারত যুদ্ধে বৈদেশিক সমর্থনের ওপর মূল্যায়ন করে ন্যাপের এক অংশ মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে চীনপন্থি লাইন সমর্থন করেন এবং পাকিস্তানের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। অপর অংশ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে যুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা পাকিস্তানকে একই সঙ্গে মার্কিন সামাজ্যবাদ ও চীনের দালাল বলে অভিহিত করে। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির যেসব নেতাকর্মী ন্যাপের সঙ্গে মিলেমিশে

www.pathagar.com

মূল সংগঠন ও বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন সঙ্গত কারণেই তারা মাওলানা ভাসানী ও মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যান। এ সময় হাতেম আলী খান মোজাফফর আহমদের প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি তখন ন্যাপ কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য ও টাঙ্গাইল জেলা ন্যাপের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন।

ন্যাপের দ্বিধাবিভক্ত প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পর পরই ১৯৬৬ সালে কুলাউড়ায় কৃষক সমিতির সম্মেলন আহবান করা হয়। এ সম্মেলনে কৃষক সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এখানে দু'টি প্যানেল হয়। এক প্যানেলে মাওলানা ভাসানী সভাপতি ও আবদুল হক সাধারণ সম্পাদক হন। অন্য প্যানেলে আমজাদ হোসেন সভাপতি ও হাতেম আলী খান সাধারণ সম্পাদক হন। এই দ্বিধাবিভক্তি ছিল হাতেম আলী খানের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কারণ এতে মাওলানা ভাসানীর মত জনপ্রিয় একজন কৃষক নেতার সঙ্গে তার কাজের ক্ষেত্র আলাদা হয়ে যায়। এতে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন, কিন্তু ভেঙ্গে পড়েননি, মনোবল হারাননি। কারণ হাতেম আলী খান নিজেও একজন বড় মাপের কৃষক নেতা ও সংগঠক ছিলেন। কৃষক সমিতিতে জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত করার পেছনে তার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি।

এ দেশে সংগঠিত ধারায় কৃষক আন্দোলনে কৃষক সমিতি আন্দোলনের চরিত্র বদলে দিয়েছিল। তিরিশের দশকে কৃষক আন্দোলন যেমন - খাজনা, প্রজাস্বত্ব, ক্যানেল কর, মহাজনী ঋণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে শুরু হয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে ফসল ভাগের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল। ষাটের দশকের কৃষক আন্দোলনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল জমি, কাজ, মজুরি, ঋণ ইত্যাদি। এ সময় আইয়ুব খানের ভূমি নীতির ফলে একদিকে অল্পসংখ্যক লোকের হাতে দ্রুত জমি চলে যাচ্ছিল। অপরদিকে কৃষকরা জমিসহ উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ হারিয়ে বর্গাদার, ক্ষেত মজুর এবং বেকার ও অর্ধবেকারে পরিণত হচ্ছিল। একদিকে জমি থেকে উচ্ছেদ, অপর দিকে কাজের অভাব গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। কৃষকদের একমাত্র জাতীয়ভিত্তিক সংগঠন হিসাবে কৃষক সমিতি কৃষক স্বার্থের অনুকূলে কাজ করেছে। এর পেছনে হাতেম আলী খানের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাংগঠনিক প্রতিভা বিপুল অবদান রেখেছে।

১৯৬৭ সালে কৃষক সমিতি ঢাকা জেলার রায়পুরা অঞ্চলে এক বিশাল কৃষক সমাবেশের আয়োজন করে । এ সমাবেশে প্রায় ১০ হাজার কৃষক সমবেত হয় । সমাবেশ শেষে তার বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তৎকালিন গভর্ণরের কাছে প্রদানের জন্য মিছিল করে কৃষকরা ঢাকার দিকে অগ্রসর হয় । সন্ধ্যার দিকে মিছিলটি মাধবদী বাজারে এসে পড়ে । তখন প্রায় ৬/৭শত পুলিশ

www.pathagar.com

অতর্কিতে মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ শুরু করে । এতে বহু কৃষক আহত হয় । অনেকে গ্রেফতার হন । মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় । এ বর্বর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে পরদিন এক প্রতিবাদ সমাবেশ চলার সময় পুলিশ সভাস্থল থেকে কৃষক সমিতির নেতা হাতেম আলী খাঁন ,হাজী মোহাম্মদ দানেশ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন ও সিরাজুল ইসলাম খাঁন সহ আরো কয়েকজনকে গ্রেফতার করে । এর কিছু দিন পর হাতেম আলী খাঁনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় অভিযোগ করা হয় যে, মাধবদী ঘটনার কিছু দিন আগে নেত্রকোণা মহকুমার বোয়র হাটে আয়োজিত এক কৃষক সমাবেশে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক বক্তৃতা দিয়েছেন। এ অভিযোগে তাকে আড়াই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

www.pathagar.com

সাত ঃ স্বাধীনতার সংগ্রামে হাতেম আলী খান

১৯৬৮ সালে ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালে মার্চের মধ্যে কৃষক জনতার এক সর্বাত্মক অভ্যুত্থান শুরু হয়। দলবদ্ধ কৃষকরা গ্রাম্য টাউট ও চোর-বাটপারদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। কৃষক জনতার হাতে অনেকে নিহত হয়। হাজার হাজার কৃষক দলবদ্ধ হয়ে অত্যাচারি টাউটদের ওপর চড়াও হয়। জোতদার, মহাজন টাউট এসব শোষকরাই ছিল আইয়ুব খান ও তার সরকারের প্রধান মিত্র। গ্রাম বাঙলার এসব গণদুষমনদের বিচারের জন্য গড়ে ওঠে গণআদালত। গণরোষের কারণে '৬৯' এর ২৫ মার্চ আইয়ুব শাহীর পতন ঘটে। এরপর পরই হাতেম আলী খান জেল থেকে মুক্তি পান। জেল থেকে বের হয়েই তিনি কৃষক সমিতির সংগঠনিক তৎপরতা শুরু করেন।

১৯৭০ সালে ৩০ মার্চ ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেন। এই আদেশের অধীনে তিনশ তের সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় সংসদ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য জাতীয় পরিষদে একশ বাষট্টিটি আসন বরাদ্দ করা হয়, পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য একশ আটত্রিশটি। তেরটি আসন সংরক্ষিত রাখা হয় মহিলাদের জন্য। এর মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত মহিলা আসনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে - ৭ ও ৬ জন। ৫ অক্টোবর সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য হয় এ নির্বাচনে হাতেম আলী খান ন্যাপের (মোজাফফর) একজন প্রার্থী হিসাবে টাঙ্গাইলের গোপালপুর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দীতা করেন। কিন্তু নিজ এলাকায় বিপুল জনপ্রিয়তা সত্বেও কালো টাকার দৌরাত্বের কাছে তিনি পরাজিত হন। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষমতাসিন সরকার ফলাফলকে অবজ্ঞা করে। তারা অস্ত্রের জোরে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ থেকে বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করে। গোটা জাতি পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে।

২৫ মার্চ থেকে হানাদার বাহিনী রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেপরোয়া গণ হত্যা শুরু করে। এ অবস্থায় পূর্ব-বাঙলার মানুষ পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেয়। এ ব্যাপারে প্রথম এগিয়ে আসেন সেনাবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশে কর্মরত বাঙালি অফিসার ও জওয়ানরা। পাক বাহিনী পরিকল্পিতভাবে ঢাকায় অবস্থানরত সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার জওয়ানদের নিরস্ত্র করে ফেলেছিল। ঢাকার বাইরে সেনানিবাসগুলোতে

www.pathagar.com

অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হলেও যে কোন সময় পাক বাহিনীর হামলার আশঙ্কায় বাঙলার অফিসারের জওয়ানরা অস্ত্রের ওপর যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ রেখেছিল। ঢাকার রাজার বাগে অবস্থিত পুলিশ ব্যারাকে পুলিশ বাহিনী এবং পিলখানায় ইপিআর বহিনী সর্বপ্রথম পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সূচনা করে। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এ প্রাথমিক প্রতিরোধ তেমন কার্যকর হয়নি। এ সময় হাতেম আলী খান বেলুয়াতে ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এখানে তিনি নিজ এলাকার তরুণদেরকে সংগঠিত করা শুরু করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সবার সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তৎপরতা শুরু করেন। মাওলানা ভাসানী এ সময় তাকে ভারতে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি দেশের অভ্যন্তরে থেকেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের কাজ করেন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তিনি কখনো শ্বশুয়ার চর এবং কখনো হেমনগর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের দিকনির্দেশনা ও নানাভাবে সহায়তা করেছেন। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর দেশ হানাদার কবল মুক্ত হয়।

www.pathagar.com

আট ঃ স্বাধীনতারোত্তরকালে কৃষক সমিতি

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে কৃষক সমিতির এক প্রতিনিধি সভা আহবান করা হয়। এ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, স্বাধীন বাঙলাদেশে কৃষক সমিতির প্রথম সম্মেলন মার্চ মাসে বেলাবোতে অনুষ্ঠিত হবে। এ সম্মেলন সফল করার জন্য হাতেম আলী খান দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন। মার্চে বেলাবোতে প্রায় এক লাখ কৃষক সমবেত হয়। ১৯৪৫ সালে নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনের পর এটাই ছিল দেশের সবচেয়ে বড় কৃষক সম্মেলন। সম্মেলনে মনিসিং সভাপতি এবং হাতেম আলী খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর থেকেই শুরু হয় জেলায় জেলায় ঘুরে সংগঠন গড়ার কাজ। সারাদেশ সফর করে তিনি সংগঠনের ভিত শক্তিশালী করে তোলেন। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে হাতেম আলী খান ন্যাপ(মোজাফ্ফর)-এর মনোনয়ন নিয়ে গোপালপুর-ভূঞাপুর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে তিনি বিপুল সংখ্যক ভোট পেলেও প্রতিপক্ষ শাসক দলের প্রার্থীর ব্যপক কারচুপির মুখে সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। ১৯৭৪ সালে বগুড়াতে কৃষক সমিতির ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া সম্মেলনে হাবিবুর রহমান সভাপতি, হাতেম আলী খান সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং আমজাদ হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হাতেম আলী এ সময় ভুখা-নাঙ্গা মানুষের পাশে থেকে তাদের খাদ্য সংস্থান করে দেন। দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের বীজের অভাব দেখা দিলে তিনি বীজ সংগ্রহ করে দিতেন। যেখানে কৃষকদের সমস্যা সেখানেই হাতেম আলী খান গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে কৃষকদের লাঙ্গল-গরু, বীজ ও অর্থের সংস্থান করে দিয়েছেন। এ সময় গ্রামে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে তার শরীর ভেঙ্গে পড়ে।

১৯৭৬ সালের মার্চে রায়পুরায় কৃষক সমিতির তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । সম্মেলনে হাজার হাজার কৃষক সমবেত হয় । রায়পুরা সম্মেলনে হাতেম আলী খান কৃষক সমিতির সভাপতি ও ফজলুল হক খন্দকার সাধারণ সম্পাদক নিবার্চিত হন । সংগঠনের সভাপতি হবার অল্প কিছু দিন পর তিনি কণ্ঠক্যান্সারে আক্রান্ত হন। কিন্তু ভয়াবহ ব্যাধির মরণকামড় রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা ,লেংটি পড়া ,গামছা কাধে ,হুকা হাতে লঙ্গলের পেছনে ধাবমান কৃষককের মুখ তার মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি । তাই অসুস্থ শরীর নিয়েও দুখী কৃষকরে মুক্তির জন্য তিনি অবিরাম কাজ করে গেছেন । দীর্ঘ আট মাস কণ্ঠক্যানসারে ভোগার পর ১৯৭৭ সালের ২৪ অক্টোবর তিনি তাঁর বড় মেয়ের উত্তর শাহজাহানপুরস্থ বাস ভবনে রাত ৮.৩০ মিনিটে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বেশ কিছু দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তিনি হাসপাতালের নিরক্ষর আয়াদের স্লেট-পেন্সিল ক্রয় করে দিয়ে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করে গেছেন।

www.pathagar.com

নয় ঃ উপসংহার

হাতেম আলী খান একজন শ্রেণীচ্যুত মানুষ ছিলেন । জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি জমিদার বিদ্বেষী ছিলেন এবং কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেলেন । গোটা দেশকে তিনি একটি কৃষক পরিবারে মনে করতেন । আর এজন্যই যে কোন কৃষক পরিবারের সমস্যকে তিনি তার নিজের সম্যসা হিসাবে বিবেচনা করেছেন । একটি ছোট ঘটনা তুলে ধরাছি । হাতেম আলী খানের জেষ্ঠ্য পুত্র কামরুজ্জামান খান খসরু তখন সবে সরকারি প্রাইমারি স্কুলে চাকুরিতে ঢুকছেন । কিন্তু চাকুরিস্থল দুরে হওয়ায় তার থাকা খাওয়ার সমস্যা দেখ দেয়। তাই তিনি একদিন পিতার কাছে আবদার জানালেন যে, বাবা, মহকুমা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গেতো আপনার ভাল জানাশুনা রয়েছে, তাকে যদি আপনি একটু বলে দেন, তো কাছাকাছি হয়তো আমার একটি বদলির ব্যবস্থা হতে পারে। আপনি বললেই কাজটা হয়ে যাবে। পুত্রের কথার উত্তরে হাতেম আলী খান বললেন যে, তোমার পরিবর্তে যাকে বদলি করা হবে তারও তোমার মতই অসুবিধায় পড়তে হবে। থাকা খাওয়ার সদস্যা দেখা দেবে। সেওতো তোমার মতই আরেক পিতার সন্তান। এখন তুমিই আমাকে বল একজন পিতা হয়ে আমার এ কাজটা করা উচিত কিনা'। কামরুজ্জামান খান জবাব শুনে নীরবে পিতার কাছ থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। কৃষকের কথা চিন্তা করে হাতেম আলী খান কলমও হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তার লেখা দু'টি বইয়ের নাম পাওয়া গেছে। বই দুটি হচ্ছে - ১. কৃষকের সমস্যা, (প্রকাশকাল ১৯৬৪) এবং ২. কৃষক সমাজ কোন পথে (প্রকাশকাল ১৯৭২)।

হাতেম আলী খানের জীবন ছিল সুদীর্ঘ সংগ্রামে স্পন্দিত। তার সংগ্রামী জীবনে তিনি তের বার কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন। তার সাংগঠনিক প্রতিভা, আত্মত্যাগ, চরম নির্যাতন সহ্যের ক্ষমতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, সহকর্মীদের প্রতি তার দরদ, মানব প্রেম এবং প্রয়োজনে নিজের সমস্ত শক্তি নিংড়ে কাজ করার ক্ষমতা ছিল অকল্পনীয়। তিনি ছিলেন সাদামাটা মানুষ। তার সম্পর্ক ছিল মাটি ও মানুষের সঙ্গে। মতাদর্শের দৃঢ়তায় তিনি ছিলেন অবিচল-কঠোর, নিষ্ঠায় স্থির-কল্পহীন। কিন্তু হৃদয় ছিল সুকুমার বৃত্তিতে ভরা, অসীম মায়ায় সংলিপ্ত ও স্নেহে সমপরিমাণেই সজীব।

হাতেম আলী খানের কর্মজীবন ছিল বিস্তীর্ণ ও বিশাল, কিন্তু কল্পনাতীতভাবে তা ছিল নিভৃত। তিনি ছিলেন এক অতুলনীয় রহস্যজনক মানুষ। তার পরিবার ও ঘনিষ্ঠ জনরাও তার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন না। কারণ তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ।

www.pathagar.com

তার রাজনৈতিক চেতনার উৎস ছিল বঞ্চিত জনগণ, খেটে খাওয়া ও সর্বহারার দল। তাই তাকে পাওয়া যাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের একান্ত নিকটে ও সর্বহারা জনতার কাতারে। অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পুরোভাগে। তার প্রত্যয় ছিল শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলার। কৃষক, মজুর, জেলে-তাতী, কামার-কুমার প্রভৃতি মেহনতি মানুষ নিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম শুরু করার। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ গড়ার। তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলেন শোষণের সকল উৎসকে। এ মহৎ মানুষটিকে স্মরণ ও তার ইতিহাস বিনির্মাণ করতে গিয়ে আমরা জনগণের সংগ্রামের কাহিনী উন্মোচন করি। তিনি ছিলেন মনুষ্যত্ব ও মহৎ মূল্যবোধের প্রতিক, রাজনীতির ক্ষেত্রে দূর্লভ, দুষ্প্রাপ্য এক ব্যক্তিত্ব, আজকের দিনে যা দূর্নিরীক্ষ্য।

*

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. কৃষক নেতা হাতেম আলী খান (পুস্তিকা) ঃ সত্যেন সেন
২. কাছের মানুষ হাতেম আলী খান ও অন্যান্য প্রবন্ধ ঃ মফিজ-উল-হক
৩. ময়মনসিংহের চরিতাভিধান ঃ দরজি আবদুল ওয়াহাব
৪. মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী ঃ হাসান আবদুল কাইয়ুম
৫. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ঃ আবুল মনসুর আহমদ
৬. বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা ঃ আমজাদ হোসেন
৭. শেরে বাঙলা একে ফজলুল হক ঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ
৮. সংগ্রামের তিন দশক ঃ খোকা রায়
৯. জীবন ও সংগ্রাম ঃ মনিসিং
১০. কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ ঃ জ্ঞান চক্রবর্তী
১১. কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন, জীবন ও সংগ্রাম ঃ মোতাহার হোসেন সুফী
১২. ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ ঃ জ্ঞান চক্রবর্তী
১৩. বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন ঃ বদরুদ্দীন উমর
১৪. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্তি ঃ রণেন সেন
১৫. কৃষক সভার ইতিহাস ঃ আবদুল্লাহ রসুল
১৬. ভারতে কমিউনিজম ঃ অমলেন্দু ঘোষ
১৭. মুজফফর আহমদ, জীবন ও বৈশিষ্ট্য ঃ জিয়াদ আলী
১৮. রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও হাতেম আলী খানের পরিবারবর্গের সাক্ষাতকার।

*

www.pathagar.com

সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা

কৃষক নেতা হাতেম আলী খান

জুলফিকার হায়দার